সাহিত্যপাঠ

অষ্টম শ্রেণী



নববর্ণমালা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of Bengali for Class VIII Vide Board's Letter, T.B. No. 76/8/TB 37, Dated 27.12.76. And also Written in accordance with the Tripura Secondary Board's Syllabus for Class VIII

সাহিত্য পাঠ

(তৃতীয় ভাগ)

অষ্টম শ্রেণীর জন্য

জাতীয় সরকার কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন
শিশু-সাহিত্যিক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০ খ্রীঃ) রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্য পরিক্রমা, ভোম্বল সরদার, প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা

এবং

শ্রীস্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. এস্-সি., বি. এ. (অনার্স) এম. এ., বি. এড্
সহ-প্রধান শিক্ষক
দক্ষিণেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, কলিকাতা-৫৭

নববর্ণমালা

পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
নিত্যানন্দ সিকদার,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্,
স্টল নং ১২, ব্লক্ নং ৫
কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—মার্চ, ১৯৭৭
তৃতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯
চতুর্থ সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৮২
পঞ্চম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৮৪
ষষ্ঠ সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৮৫

মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশক্তিপদ মণ্ডল ঃ
মণ্ডল প্রিণ্টার্স
২০৯বি. বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

কবিতাংশ

॥ পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বইখানি অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। পর্ষদের নির্দেশিত মৌখিক প্রশ্ন, ব্যাকরণের প্রশ্ন, বিষয়মুখী, বস্তুমুখী নানান ধরণের প্রশ্ন, কবি ও লেখক-পরিচিতি ইত্যাদি বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হোল। সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক বইটি গৃহীত হলে বাধিত হব। বইটির উন্নতিকল্পে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

বিনীত
গ্রন্থকারদ্বয়

আমার পিতামহ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



লেখকের কথা ঃ—ঈশ্বরচন্দ্র বিত্তাসাগর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে।

লেখার কথা ঃ—এই লেখাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনী 'বিদ্যাসাগর-চরিত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এখানে লেখক অপূর্ব সাধু গদ্য ভঙ্গী ভাষার সাহায্যে তাঁহার পিতামহ তর্কভূষণ মহাশয়ের এক তেজোদৃপ্ত, সাহসী, সদাচারপূত, অমায়িক ও নিরহঙ্কার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তদীয় আকারে, আলাপে বা কার্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। নিজে যে-কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোন বিষয়ে সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান্, নিরতিশয় সাহসী এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চির-সহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটির বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে কি প্রত্যুষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্প সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায় সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই-চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেল সেলামি পাইয়া আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে তাহাদের সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ-ভালুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। একস্থলে খাল পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ

হইবামাত্র, ভালুক আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনি অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ংকর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন বটে ; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারিক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে মেদিনীপুরে পৌঁছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায় দুইমাস কাল শয্যাগত থাকিলেন এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

শব্দার্থ : নিরতিশয়—অত্যন্ত, খুব বেশী। অমায়িক—সরল। কপটবাচী—মিথ্যাবাদী। রুষ্ট—ক্রুদ্ধ। কার্যপরম্পরায়—কার্যের মধ্য দিয়া। অন্যদীয়—অপরের, অন্যের। সদাচারপূত—সৎআচার ও অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র। নিত্যনৈমিত্তিক—দৈনিক করণীয়। অবহিত—চেতনা সম্পন্ন। সর্বতোভাবে—সকল প্রকারে। অকুতোভয়—যাহার কোথা হইতেও ভয় নাই, নির্ভীক। ক্ষমতাসম্পন্ন—ক্ষমতাশালী। প্রত্যুষে—সকালবেলায়। মধ্যাহ্নে—দুপুর বেলায়। সায়াহ্নে—সন্ধ্যা বেলায়। অবধারিত—নিশ্চিত। সমবেত—একত্র। উপদ্রব—অত্যাচার। অবিশ্রান্ত—অবিরত। অনায়াসে—সহজে। পদব্রজে—পায়ে হেঁটে। শয্যাগত—শয্যাশায়ী। প্রতীয়মান—বোধ।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১। বিদ্যাসাগরের পিতামহের নাম কি ? তাঁহার দৃষ্টিতে পিতামহের যে চরিত্ররূপ ধরা পড়িয়াছে তাহা সাধু ভাষায় বর্ণনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (ক) 'তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন'—তিনি কে? তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও যথার্থবাদিতার যে পরিচয় পাইলে তাহা বল।

(খ) 'সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।'—বক্তা কে? কাহার সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে? বক্তা তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ ঋষি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কেন?

(গ) তর্কভূষণ মহাশয়ের মেদিনীপুর যাইবার অভিজ্ঞতা চলিত ভাষায় বর্ণনা কর।'

৩। (ক) অর্থ লিখ: নিরতিশয়, কপটবাচী, অন্যদীয়, অকুতোভয়, ক্ষমতা-সম্পন্ন, অবধারিত, পদব্রজে।

(খ) বাক্য রচনা কর: নিত্য-নৈমিত্তিক, প্রাণসংহার, আক্কেল সেলামি।

(গ) সন্ধি-বিচ্ছেদ কর: নিরতিশয়, মধ্যাহ্নে, নিস্তেজ, উপর্যুপরি, প্রত্যাগমন, সাদর, স্থানান্তর, নির্ভয়ে, পদাঘাত।

(ঘ) পদ পরিবর্তন কর: পরাধীন, ভীত, আক্রমণ, হিংস্র, ভদ্র।

(ঙ) বিপরীত শব্দ লিখ: নিরতিশয়, সদয়, নিরহঙ্কার, অভদ্র, পরাধীন, সাহস।

মৌখিক প্রশ্ন

১। তর্কভূষণ মহাশয় কে? ২। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাঁহার পিতামহের কি কি গুণ প্রতিফলিত হইয়াছিল?

৩। তর্কভূষণ মহাশয়ের চিরসহচর কি ছিল ও কেন?

৪। তর্কভূষণ মহাশয়কে ভালুক কখন আক্রমণ করিয়াছিল?

৫। কিসের ক্ষতচিহ্ন তর্কভূষণ মহাশয়ের শরীরে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল?

৬। তর্কভূষণ উপাধি কাহাদের হয়?

৭। ক্রোধ একটি রিপুর নাম—ক্রোধ ছাড়া আর কি কি রিপু আছে?

৮। এক ক্রোশ বলিতে কি বুঝায়?



সেকালের চিত্র
—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লেখকের কথা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। প্রাচীন ভারত বিদ্যাবিদ্ রূপেই তাঁর খ্যাতি। সারা জীবন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র লেখা লিখে গেছেন। কালিদাস ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। একমাত্র কালিদাস সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন ৩৫টি। সহজ-সরল ভাষারীতির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সম্পদ-সংস্কৃতি শাস্ত্রী মশাই পরিস্ফুট করেছেন। 'বেণের মেয়ে' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

লেখার কথা : প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির পূজারী হরপ্রসাদ সেকালের রাজা-জমিদারদের রীতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার অতি মনোরম ভঙ্গিতে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ইতিহাস মানে কেবলমাত্র সন তারিখ নয়, মানুষের জীবনাচরণ, জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরও ; এ প্রবন্ধে সেকালের শিক্ষার প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন গাছপালা, পশু-পাখি, নদীনালার সুন্দর বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট। রাজা রাজড়াদের আমোদ-প্রমোদ, বাচখেলা—সকল কিছুই অতি অনাড়ম্বর ভাষায় চিত্রিত করেছেন।

দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা, যদিও বয়স হইয়াছে, মাছধরা, কুমির মারা, হাঙ্গর ধরা, শিকার করা, বাজ পাখীর খেলা করা এই সব লইয়াই রহিলেন। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গা খুব চাওড়া, এইটা সমুদ্রের খাড়ীর মত, মাঝে মাঝে বালির চড়া। দু'একটা চড়ায়

মাটি আছে, আর তার উপর নিবিড় জঙ্গল ; আস্‌সেওড়া, পট্‌পটী, বনঝাউ, নানা রকমের লতা, কাঁটাগাছ, কাঁটানোটে, কন্টিকারী, কালকাসন্দা, চাকচাকন্দা, শ্যামকাঁটা, ফণী-মনসা, গোয়ালে-লতা। এই সবের মধ্যে পা বাড়ানো যায় না।

আবার ওপারে দূরে সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ, বেতগাছ, গোলপাতার গাছ, সঙ্গে সঙ্গে নোনা, ভাটুই, গাম্বীরা, জিউলী—খুব ঘন, তার নীচেও আবার ঘন বন। মহারাজাধিরাজের ভারি আমোদ—বালির চড়ায় কুকুর ছাড়িয়া দেন, তাহারা খরগোস, শজারু, গোসাপ, গন্ধগোকুল ধরিয়া লইয়া আসে। খরগোসও ছোটে, পিছু পিছু কুকুরও ছোটে—দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। আবার দু'মিনিট পরে কুকুরটা খরগোসটিকে দাঁতে ধরিয়া মহারাজাধিরাজকে পুরস্কার দেয়। মহারাজাধিরাজ কুকুরের গায়ে হাত দিয়ে তাহাকে আদর করিলেন, সে আবার আর একটা কি দেখিয়া ছুটিল। তাহার আদর দেখিয়া আর পাঁচটা কুকুরও আপন আপন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ছুটিল। একবার পাঁচ-সাতটা কুকুর একটা নেকড়ে বাঘকে তাড়া করিয়াছে, সে চারিদিকে ছুটিতেছে। কোথাও পরিত্রাণ নাই দেখিয়া সে যেদিকে রাজা ছিলেন সেই দিকেই ছুটিল। রাজা ও শিকারীরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু দূর হইতেই মহারাজাধিরাজের এক তীরেই তাঁর জীবন শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায় ; কত রকম শব্দ করে, গান করে, খেলা করে, আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ এক-একদিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণ-ভয়ে পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্‌-চিল্‌-চিল্‌ শব্দ করিত, এক-একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার

আর একটার উপর ধাওয়া করিত। নীচে লোক পাখী কুড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিত। মরা পাখী কতক মাটির পড়িত, কতক জলে পড়িত, কিন্তু একটিও নষ্ট হইত না। কাছে হইলে লোক সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত আর দূরে হইলে ডিঙ্গি তো ছিলই।

সকালবেলায় নদীর ওপারে জঙ্গলের নীচে চড়ার উপর শালকাঠের মত কি পড়িয়া থাকিত। যাহারা জানে না তাহারা মনে করে বাহাদুরী কাঠ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেগুলো কুমীর; নানা জাতীর কুমীর। মহারাজাধিরাজ কুমীর শিকারের জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে বর্শা, বল্লম, কোঁচা আর কয়েকজন চতুর শিকারী। কুমীরের গায়ে বল্লম বসে না; তাহাদের চোখে না হয় মুখে বিঁধিতে হয়। রাজা অনেক ধস্তাধস্তির পর কুমীরের মুখে বর্শা চালাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড কুমীর এক মোচড়ে-বর্শা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঝুপ করিয়া জলে পড়িল, কিন্তু ভাঙ্গা বর্শা বিঁধিয়া থাকায় তাহার নড়াচড়ার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। একটু চাড় পাইলেই মুখে লাগে আর যন্ত্রণায় কুমীর অস্থির হয়। শেষে সে ভাসিয়া উঠিল—অমনি অনুচরেরা প্রকাণ্ড কাছি আনিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। কুমীর মহাশয় মরিলেন, পেট চিড়িয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির করা হইল, পেটের মধ্যে তুলা ও বিচালীর কুচি পুরিয়া দিয়া আবার সেলাই করা হইল তিনি বহুকাল ধরিয়া রাজবাড়ীর দেউড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শব্দভেদী বাণের খুব চলন ছিল। আর রাজা হরিবর্মা শব্দভেদী বাণে খুব দক্ষহস্ত ছিলেন। নৌকায় বসিয়া যেই শুনিলেন, একটা শুশুক কি ঘড়েল ভুস করিয়া উঠিল, অমনি রাজার বাণ চলিল। সে বাণ অব্যর্থ। শুশুককে মরিতেই হইবে। আর শিকারীরা যেমন করিয়াই হউক তাহাকে রাজার সামনে আনিয়া উপস্থিত করিবে। শুশুকের তেল বাতের বড় ঔষধ ছিল।

হাঙ্গর এক ভয়ানক জন্তু। দেখিতে বড় আড় মাছের মত ; মুখের গোড়া হইতে দু'খানা হাড় বাহির হইয়াছে, হাড় দু'খানার দু'ধারে দু'সারি করিয়া দাঁত ; উপর-নীচের সারিসারি দাঁত একত্র হইলে চার-খানা করাতের কাজ করে। হাঙ্গরে কাটিলে তাই করাত-কাটার মত পরিষ্কার কাটা দেখা যায়। রাজাধিরাজের শব্দভেদী বাণে অনেক হাঙ্গর আপন হাঙ্গরলীলা সংবরণ করিয়াছে।

নৌকায় বাচখেলা মহারাজের আর এক আমোদ ছিল। বড় বড় নৌকা লইয়া বাচখেলা হইত। এক নৌকা পলাইতেছে, আর একখানা তাহার পিছন লইয়াছে। আর একখানা প্রথমখানাকে রক্ষা করার জন্য যাইতেছে। একখানা ঘুরিয়া মহাবেগে আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় খানার মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রথমখানার পলাইবার পথ করিয়া দিতেছে। জল তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। জলজন্তু সব পলাইতেছে বা ভাসিয়া যাইতেছে। জলজন্তুর পিছনে আবার ডিঙ্গি, পানসী, বর্শা-বল্লম লইয়া ধাওয়া করিতেছে।

শব্দার্থ ঃ মহারাজাধিরাজ—মহারাজাদেরও অধিরাজ। মহাবিহারের—বৌদ্ধমঠের। কণ্টকারী—এক প্রকার ছোট গাছ—এই গাছের শিকড়ে বসন্ত রোগের ঔষধ হয়। নিবিড়—ঘন। গন্ধ গোকুল—খট্টাস, ভাম। বাহাদুরী—কেরামতী। বাহাদুরী কাঠ—শাল, সেগুন ইত্যাদি গাছের গুঁড়ি। বাস্তবিক—প্রকৃতপক্ষে। প্রকাণ্ড—বেশ বড়। অনুচররা—সহচররা। কাছি—নারকেলের মোটা দড়ি। দেউড়ীতে—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বারে বা ফটকে। বিরাজ করা—বর্তমান থাকা। শব্দভেদী—পুরাণে বর্ণিত বাণ হইল শব্দ অনুসরণ করিয়া চলে যাহা। দক্ষহস্ত—নিপুণ হাত। শুশুক—শিশুমার। ঘড়েল—লম্বামুখওয়ালা একরকম কুমীর। হাঙ্গর—একপ্রকার হিংস্র জল জন্তু। বাচখেলা—নৌকা চালানর প্রতিযোগিতা। তোলপাড়—আলোড়ন। পানসী—ছিপ নৌকা।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'সেকালের চিত্র' নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গার চড়ায় কোন্ কোন্ গাছ ও জন্তুজানোয়ার দেখা যাইত তাহার বিবরণ দাও।

৩। মহারাজাধিরাজ হরিবর্মার শিকার-কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

৪। 'নৌকায় বাচখেলা মহারাজের আর একটি আমোদ ছিল—এই বাচ-খেলার বিবরণ দাও। ইহা ছাড়া রাজার অন্যান্য আমোদ কি কি ছিল ?

৫। 'যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে বাহাদুরী কাঠ'—কাকে ? বাস্তবিক তাহা কি ?

৬। "তিনি বহুকাল……লাগিলেন।" আলোচ্য অংশটি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে ? প্রবন্ধটির লেখক কে ? কোন্ রাজবাড়ির দেউড়ীতে কে বিরাজ করিতে লাগিল তাহা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৭। "রাজাধিরাজের শব্দভেদী……সংবরণ করিয়াছে।"—আলোচ্য অংশটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক কথাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৮। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ—

বাহাদুরী, ধস্তাধস্তি, দেউড়ীতে, অব্যর্থ, দক্ষহস্ত, শব্দভেদী।

৯। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর ও সূত্র লেখ ঃ—রাজাধিরাজ, পুরস্কার, মহাশয়।

১০। বিপরীত শব্দগুলি সাজাইয়া লেখ ঃ—অনুপস্থিত, অনাদর, সুস্থির সামনে, ক্ষুদ্র, আদর, পিছনে, প্রকাণ্ড, অস্থির, উপস্থিত।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। বয়স হইলেও মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা কোন্ কোন্ আমোদ লইয়া রহিলেন ?

২। কুমীরের কোন্ অঙ্গে আঘাত করলে কুমীরকে ঘায়েল করা যায় ?

৩। "শব্দভেদী বাণ" বল্তে কি বোঝ ?

৪। 'হাঙ্গর' দেখতে কেমন ?

৫। 'বাচখেলা' কি ?



চিকাগোর ধর্মসভা

—স্বামী বিবেকানন্দ

লেখকের কথা : স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬২, মৃত্যু ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যুগাবতার রামকৃষ্ণের প্রভাবে গৃহধর্ম ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী হন। হিন্দুধর্মের প্রসারকল্পে দেশে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। সন্ন্যাসী হবার পর তিনি আর গৃহ বন্ধন স্বীকার করেন নি—সারা জীবন দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর লেখা খুব বেশী নেই—লেখাগুলো মুখ্যতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। সৎ ও আদর্শ নিষ্ঠাময় জীবনকে উদ্দীপিত করার জন্যেও তাঁহার কিছু কিছু লেখা রয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

লেখার কথা : ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি মাদ্রাজবাসী ও অন্যান্য হিন্দুদের সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে আমেরিকা যান—সেখানে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো শহরে ধর্মসভায় যে বক্তৃতা করেন আলোচ্য প্রবন্ধে তাহারই ছবি অঙ্কিত। বিবেকানন্দের এই বক্তৃতার ফলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদেশবাসীর মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা দূরীভূত হয়।

"মহাসভা খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্প প্রাসাদ' নামক বাটিতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী 'হল' নির্মিত হইয়াছিল।

এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার ও বোম্বাই-এর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধী জৈন সমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসাণ্ট ও চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শিল্প-প্রাসাদ পর্যন্ত ধূমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল।

কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি 'হল' তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬। ৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাট্‌ফর্মের উপরে পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্ন কখনও সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে। সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতিপর্ব ধূমধামের সহিত আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন।

অবশ্য আমার বুক দুড়দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। বহু প্রতিনিধি তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু'এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী

ভাই ও ভগিনিগণ, বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, সে সময় এমন করতালিধ্বনি উঠিল যে, কাণ যেন কালা করিয়া দেয়! তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

পরদিন সব খবরের কাগজ বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালম্'—হে ভগবান, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল'। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমরা বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন 'হলে' এত লোক হইয়াছিল যে আর কখনও এরূপ হয় নাই।

শব্দার্থ: মহাসভা—বিরাট সম্মেলন। শিল্পপ্রাসাদ—চিকাগো শহরে একটি বিরাট অট্টালিকা। অধিবেশন—সভা। সমবেত—মিলিত। ব্রাহ্মণ-সমাজের—ব্রহ্মের উপাসক সম্প্রদায়ের। গ্যালারি—(Gallery)—সারিবন্ধ বসিবার আসন। সমক্ষে—সম্মুখে। পূর্বাহ্নে—প্রথম ভাগে, (এখানে) সভার প্রথমে। প্রতিনিধি—অপরের হয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তি। গৈরিক বসনে—গিরিমাটি রঙ্ দিয়ে ছাপানো কাপড়ে। শ্রোতৃবৃন্দের—শ্রোতাদের। ধন্যবাদ—সাধুবাদ। আবেশ—অনুভূতির প্রবল প্রকাশ। সমগ্র—সারা, সমস্ত। মূকং করোতি বাচালম্—বোবাকে মহাবক্তা করিয়া তোলে। মহাবক্তা—শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাকারী। জয়যুক্ত—বিজয়ী। হিন্দুধর্মসম্বন্ধে—হিন্দুধর্মের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা অনুসারে চিকাগো ধর্মসভার একটি ভাষাচিত্র অঙ্কণ কর।

২। 'তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল'। কাহাকে কিভাবে জানিতে পারিল? ব্যক্তিটির সম্যক্ পরিচয় দাও।

৩। "সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম।" —কোন্ দিন হইতে ? কে, কিভাবে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন ?

৪। 'মূকং করোতি বাচালম্'—কথাগুলি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে ? প্রবন্ধটির রচয়িতা কে ? কোন প্রসঙ্গে কে এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ?

৫। "আর আমি.........বক্তৃতা করিবে।"—কথাগুলি কে, কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন তাহা লেখ এবং বক্তার মনের কথাটি সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।

৬। অর্থ লেখ :—অস্থায়ী, সর্বজাতীয়, সুশিক্ষিত, শ্রেণীবদ্ধভাবে, সমাবেশ, জন্মাবচ্ছিন্ন, আকৃষ্ট, অবশ।

৭। পদ পরিবর্তন কর :—সমবেত, আকৃষ্ট, পরিচিত, অবশ, ক্ষুদ্র, সমগ্র।

৮। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—নির্বোধ,জন্মাবচ্ছিন্ন।

৯। বাক্যে ব্যবহার কর :—ধূমধাম, সর্বজাতীয়, রীতিপূর্বক, সুশিক্ষিত সমবেত।

১০। পরিচয় দাও :—

ব্যারোজ মহোদয়, এনি বেসান্ট, চিকাগো ধর্মসভা, টীকাকার শ্রীধর।

মৌখিক প্রশ্ন :—

১। চিকাগো কোথায় এবং কি জন্য এত বিখ্যাত ?

২। চিকাগোর ধর্মসভাকে 'মহাসভা' বলা হইয়াছে কেন ?

৩। চিকাগো ধর্মসভায় ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ ধর্মের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ?

৪। 'মূকং করোতি বাচালম্' কথাটির বাংলায় অর্থ কি ?

৫। কোন্ কথার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন ?

৬। বিবেকানন্দ দেবী সরস্বতীকে কেন প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলেন ?

৭। কোন্ কোন্ ধর্মের প্রতিনিধি ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন ?



স্মৃতিচারণ



রাজনারায়ণ • বঙ্কিমচন্দ্র

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখকের কথা ঃ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ এই ৮১ বছরের আয়ুপরিধির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের কর্মকাল বিস্তৃত। তিনি পিতা-মাতার চতুর্দশ সন্তান, অষ্টম পুত্র। তিনি মুখ্যতঃ কবি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতি ঘটে। তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বিভিন্ন-পত্রিকা সম্পাদন করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজের দেওয়া 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

লেখার কথা ঃ 'স্মৃতিচারণ'—কবি রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির একটি বিশেষ অধ্যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সে-যুগের সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। যে-সকল মহাপুরুষ ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে এসেছেন এঁরা তাঁদেরই দু'জন। সে-যুগের স্বদেশী আন্দোলনও ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে লালিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের সুন্দর চিত্রগুলি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে অংকনে সমর্থ হয়েছেন।

রাজনারায়ণ ঃ

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি সম্পূর্ণ পাকিয়াছে; কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে

সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট, তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল! এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতো ছিলেন। জীবনের শেষপর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ-কষ্ট—'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক-দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ; সে তাঁহার তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা-দীনতা-অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদিগের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক তাহা তিনি খেয়ালই করিতেন না—

> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
> এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন,

রোগে-শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি, সে অনেকদিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র 'তিনি কে' ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে, সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুইহাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারো সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটিই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশীল মননশীল লেখকের ভাব ছিল তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল। তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে ইহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমনি সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়াইয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

শব্দার্থ ঃ—বৈপরীত্যের—বিপরীত ভাব বা অবস্থার। প্রবীণতা—প্রাচীনতা। গৌরকান্তি—ফরসা রঙ্‌। পাণ্ডিত্যের—বিদ্যাবত্তার। অজস্র—অসংখ্য। হাস্যোচ্ছ্বাস—হাসির আবেগ। প্ল্যান—(Plan)—পরিকল্পনা। অনুরাগ—প্রীতি, ভালবাসা। হাস্য মধুর জীবন—যে জীবন হাস্যময় এমন। তেজঃপ্রদীপ্ত—অতিশয় তেজ শক্তিতে উজ্জ্বল। অপরিম্লান—মলিন হয় নাই এমন। পবিত্র—নিষ্পাপ। স্মৃতিভাণ্ডারে—যে স্থানে স্মৃতিরক্ষা হয়। সূত্রপাত—সূচনা। কৌতূহল—জানার আগ্রহ। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে—উগ্রদৃষ্টি শক্তিতে। সংবরণ—সামলানো। খড়্গনাসায়—উন্নতনাসিকায়। রাজতিলক—রাজটিকা। ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ। অশ্লীল—কুরুচিপূর্ণ। ইতর—নিকৃষ্ট। উপমা—তুলনা। দৃশ্যটা—(এখানে) ঘটনাটা।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। রাজনারায়ণ বসুর দেশপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া তুমি নিজে লেখ।

৩। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোথায়, কখন প্রথম দেখেন তিনি কিভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন লেখ।

৪। 'এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল'—কোন্‌খানে? ঘটনাটি কি?

৫। নীচের বক্তব্যগুলি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত এবং কে, কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন লেখ। কথাগুলির তাৎপর্য বিস্তারিত কর।

(ক) তাঁহার বাহিরের……রাখিয়া দিয়াছিল।

(খ) দেশের প্রতি……তেজের জিনিস।

(গ) লেখা পড়িয়া……খুব লাগিয়াছিল।

(ঘ) এদিকে তিনি……পরিপূর্ণ ছিলেন।

৬। অর্থ লেখ ও পদ নির্ণয় কর :

বৈপরীত্যের, প্রবণতা, অনুরাগ, সম্মিলনী, উদ্যোগী, বিশিষ্টতার, বুদ্ধিশীল।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

নবীনতা, সম্পূর্ণ, অনৈক্য, অস্বাস্থ্য, উন্নতি, সাধ্য অস্তু, অনুরাগ, পণ্ডিত, ইতর।

৮। সমাস নির্দেশ কর :

হাস্যোচ্ছ্বাস, অনভ্যাস, অপরিম্লান, গৌরকান্তি, খড়্গনাসা, রাজতিলক, অশ্লীল।

৯। সঠিক সন্ধিবন্ধ পদটি রাখিয়া অন্যটি কাটিয়া দাও :

ভগবৎ + ভক্ত = ভগবদ্ভক্ত, ভাগবৎক্ত ; সর্ব + অপেক্ষা = সর্বপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা ; উৎ + যোগী = উযোগী, উদ্যোগী, হাসি + উচ্ছ্বাস—হাস্যোচ্ছ্বাস, হাসিচ্ছ্বাস।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র,—কে?

২। রাজনারায়ণ বসুর গুণের কথা তিনটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ কর।

৩। 'একসূত্রে……সহস্র জীবন।'—এই গানটি কাহার লেখা? তুমি পুরা গানটি জান কি?

৪। চন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় কি?

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কোথায় সাক্ষাৎ হয়?



মানিকলাল

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকের কথা : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. এবং বি. এল. পাশ করেন। সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরির কারণে তিনি দীর্ঘদিন মেদিনীপুরে ছিলেন। শেষজীবনে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' এবং 'সি. আই. ই.' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখক। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীর উৎপত্তি তাঁর কাঁথিতে চাকরি করার সময়। রচিত গ্রন্থ ৩৪টি। ১৫ বৎসরে বয়সে তিনি দু'খানি কাব্যও রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শন' তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।

লেখার কথা :—আলোচ্য 'মানিকলাল' গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' নামক উপন্যাসের অংশ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের এই একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে ঔরংজেবের বিবাহের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে রাজসিংহের সঙ্গে ঔরংজেবের বিরোধ—রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ—এ কাহিনীর উপরই উপন্যাস বিস্তৃত। রাজা রাজসিংহের বীর্য ও পৌরুষ আলোচ্য আখ্যানে সুন্দরভাবে চিত্রিত।

অশ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিলেন, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা তিনি দেখেন নাই, তখন তিনি পৌঁছান নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ঘুরিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিলেন।

পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিজয়ী, এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার আরোহী পদাচারে অতি দ্রুতবেগে পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন,—"চারিজনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক্'। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া-ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি লইয়া গিয়াছে ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"একগাছি মুক্তার বালা, কয়েকটি আশ্‌রফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্তা বলিলেন,—"আপনি এখানে থাকুন। উহারা কোন্‌দিকে গেল দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিলেন,—"দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।" অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এইব্যক্তি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত যে-পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বন-মধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে

লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তারপর রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না, নয় ঐ পর্বত-তলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেইস্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্বক সেই সকল চিহ্ন-লক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন। রাজপুত তখন গুহা-মধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন, পরে অসি নিষ্কোসিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বামহস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময় রাজপুত অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। গুহায় প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দিয়া দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল ছিল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল তাহার দিকে ফিরিল। রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে সে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া

তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন। সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মানিকলাল বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বার-পথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা মানিকলালের পায়ে ঠেকিল। মানিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হউন, নইলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বামহস্তে ধরিতাম, কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তলটি দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাঁহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মানিকলালের চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকছেদনে উদ্যত হইলেন।

মানিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন, রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মানিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নই। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীনা, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব তবে সে খাইবে; আমি

তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সেও মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল ; "মহারাজাধিরাজ ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন ?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?" তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবনদান করিলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।"

মানিকলাল বিনীতভাবে বলিল,—"মহারাজাধিরাজ ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডের বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখে শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিল, অস্থি কাটিল না। তখন মানিকলাল এক শিলা-খণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর একখণ্ড প্রস্তর দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল,—"মহারাজ ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। বলিলেন,—"ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?"

দস্যু বলিল,—"এ অধমের নাম মানিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মানিকলাল, আজ হইতে তুমি আমার কার্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুর যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।" মানিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশ্‌রফি চারিভাগ আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনার জন্যই। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মানিকলাল, পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস, তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মানিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—একবার মুখও বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণ তটিনী তীরে সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শব্দার্থ :—অশ্বারোহী—অশ্বে বা ঘোড়ায় আরোহণকারী। পর্বতান্তরালে—পাহাড়ের আড়ালে। অদৃশ্য—অন্তর্হিত। পাদচারে—পায়ে হেঁটে। পথের আলাপ—পথে কথাবার্তার মাধ্যমে পরিচয়। আশ্‌রফি—স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। আগন্তুক—অপরিচিত ব্যক্তি। নিদর্শন—চিহ্ন। ইতস্ততঃ—এখানে সেখানে। অনুসরণ—পিছন পিছন গমন। বিলক্ষণ—যথেষ্ট রকম। প্রচ্ছন্ন—লুক্কায়িত। অবতরণ—নামা। নিষ্কোষিত—উন্মুক্ত। দৃঢ় মুষ্টি ধৃত—হাতের মুঠায় শক্ত ভাবে ধরা। ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। রাজধর্মে—রাজার পক্ষে করণীয় কাজে। অধমের—নিকৃষ্টের। মার্জনা—ক্ষমা। নামাঙ্কিত—নাম লিখা আছে এমন। মুক্তাবলয়—মুক্তা দিয়ে তৈয়ারী বালা। দৃষ্টিপাত—লক্ষ্য করা। রাণা—রাজপুত রাজার উপাধি। ক্ষীণ—শীর্ণ। তটিনী—নদী। সুরম্য—অতি সুন্দর। নিভৃত—নির্জন। উপস্থিত—হাজির।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। মহারাণা রাজসিংহ কিভাবে অনন্ত মিশ্রের অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করিলেন তাহা গল্পাকারে সংক্ষেপে লেখ।

২। মানিকলাল কে? কি অবস্থায় পড়িয়া সে রাণা রাজসিংহের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল?

৩। রাজসিংহ যে একজন প্রকৃত রাজপুত যোদ্ধা এই প্রবন্ধ অনুসারে তাহার পরিচয় দাও।

৪। কাহার উক্তি বল :

(ক) 'তাহারা চারিজন, আপনি একা।'

(খ) 'মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন, রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।'

(গ) 'তুমি মরিতে এত ভীত কেন?'

৫। "আমি তোমার… …পতিত হইব।"—এই অংশটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত। কে, কোন্ প্রসঙ্গে কথাগুলি বলিয়াছেন।

৬। "আমি মরিলে… …তাহাকে মারুন"—কথাগুলি কে, কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছিল? এখানে 'সে' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে? সে মরিবে কেন?

৭। শূন্যস্থানে প্রবন্ধের কথা বসাও :

(ক) মানিকলাল বলিল, "আমি—ভীত নই। কিন্তু আমার একটি—বৎসরের কন্যা আছে; সে—,তাহার আর কেহ নাই, কেবল—। আমি—তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার—গিয়া আহার দিব, তবে সে —, আমি তাহাকে রাখিয়া — পারিতেছি না।"

(গ) মানিকলাল তখন রাণার—গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিত করাইয়া—প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত —, — পত্র এবং — চারিভাগ আনিয়া দিল।

৮। সমাসবদ্ধ কর : অশ্বারোহী, পর্বতান্তরাল, অদৃশ্য, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী প্রশ্নকর্ত্তা, গৃহাদ্বার, পাদস্পর্শ।

৯। যে উত্তরটি ঠিক সেটিতে টিক্ চিহ্ন দাও। (ক) যিনি রাজপুতনার অধিবাসী—১। তিনি রাজসিংহ। ২। তিনি রাজপুত। ৩। তিনি মহারাজ। ৪। তিনি মিশ্রঠাকুর।

(খ) যিনি বাণিজ্য করেন—১। তাকে বন্য বলে। ২। তাকে বণিক্ বলে। ৩। তাকে বনানী বলে। ৪। তাকে বাণিজ্যানী বলে।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'মানিকলাল' গল্পটি কাহার লিখিত? কোন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত?

২। 'রাণা' উপাধি কাহারা লইতেন? তুমি রাণা রাজসিংহ ছাড়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আর কোন রাণার নাম জান কি?

৩। মানিকলাল বলিয়াছে সে রাজপুতকলঙ্ক—আর কোন রাজপুত কুলাঙ্গারের নাম জানা থাকিলে বল।

৪। রাজসিংহ ও মানিকলালের মধ্যে কাহাকে তোমার ভাল লাগিল?



স্বদেশ প্রেম ও আদর্শের দীক্ষা

—সুভাষচন্দ্র বসু

লেখকের কথা ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়—সুভাষচন্দ্র বসু। 'নেতাজী' নামে তিনি সুপরিচিত। কটক শহরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নানা রকম মতভেদ ও মতবিরোধ আছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৪র্থ স্থান অধিকার করে আই. সি. এস. পাশ করেন। প্রথম জীবনে কংগ্রেস ও পরে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। দৃপ্ত ভাষার বক্তৃতার অংশ ও কিছু কিছু প্রবন্ধ সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যাবদান।

লেখার কথা ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোহিত সুভাষচন্দ্র জ্বালাময়ী ভাষায় যে সব বক্তৃতা করেছেন এবং মাঝে মাঝে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেইগুলোই সুভাষচন্দ্রের সাহিত্য কৃতি। স্বাধীনতা অর্জনের পাথেয় হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের জাগরণ, পৌরুষের ও যৌবনশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে সেই আত্ম-অনুসন্ধান ও দীপ্ত প্রাণের প্রতিষ্ঠার তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম-বা আদর্শ (Ideal) আছে। সে আদর্শকে (Ideal) অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবৎসর ব্যাপী হইয়া থাকে, জাতির জীবনেও সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন—আদর্শ একটা প্রাণহীন, গতিহীন বস্তু নয়; তার বেগ আছে, তার গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে।

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্ম-বিকাশের চেষ্টা করিতেছে, আমরা তার পরিচয় সবসময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে, শুধু সেইব্যক্তি বাহ্য ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম—The ideal of the age—ইহার উপলব্ধি হইলে মানুষ বুঝিতে পারে তার পথ কি, তার পথপ্রদর্শক কে?

পূর্বে যে আদর্শ বাঙ্গলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, যে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী ষড়রিপু জয় করিয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ-বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল—ব্যক্তির বিকাশ; তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন, "Man-making is my mission"—খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই সর্বধর্ম সমন্বয় ও সকল মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাসৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বে যখন আমাদের দেশের নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পথ-প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যেসব অধর্ম চলিতেছিল এবং যেসব আবর্জনা ও কুসংস্কার ধর্মের নামে সমাজদেহকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিন্দুসমাজকে

শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আগে চিন্তাজগতে আলোড়ন উপস্থিত করা দরকার—তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-রাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে তখনও এই আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিয়াছিল যে ইংরেজের ভারত-বিজয় একটা দৈবঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার আদর্শের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom, Freedom is the song of the soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে।

স্বাধীনতার আদর্শের যেরূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। আমরা সর্বপ্রথমে অরবিন্দের মুখে রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাই। অরবিন্দ তখন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখিলেন, "We want complete autonomy—free from British control"—"আমরা আধিপত্য-মুক্ত পূর্ণ স্বায়ত্ব-শাসন কামনা করি" তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙ্গালী বুঝিল যে, এতদিন পরে সে মনের মত মানুষ পাইয়াছে।

এইভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙ্গালীজাতি

ঝড়-তুফান অগ্রাহ্য করিয়া বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিল। তারপর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন অসহযোগের বাণীর সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধীর মুখে আর একটা কথাও শুনিতে পাইলাম—"জন-সাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে না পারিলে স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে তথা বাঙ্গালা দেশে কিন্তু নূতন নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু জন-সাধারণ সম্পর্কে যে বাণী মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা গেল তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে নূতন কথা।

এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে,—যে স্বরাজ তিনি লাভ করিতে চান,—তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, জন-সাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses"—এই আদর্শ তিনি নিখিলভারতীয় শ্রমিক-সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

যে সার্বজনীন বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাই এই যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বরাজের আদর্শ আগে উপলব্ধি করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ তরুণ সমাজকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে,—যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছি—সেখানে সকলেই মুক্ত, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত—রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। এই তিন প্রকার বন্ধন বা অধীনতা হইতে আমরা মানবজাতিকে—দেশবাসীকে মুক্ত করিতে চাই।

যাহারা মনে করে যে রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে, তাহারাসকলেই ভ্রান্ত। আমাদের এই শতছিদ্রযুক্ত পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ ভোগ কোনও দিন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনীতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি স্বরাজের আস্বাদ কি বুঝিবে? তার কাছে সামাজিক ও অর্থনীতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড় সত্য—এইসব অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাহার কাছে মূল্যহীন হইয়া পড়িবে।

আজ দেশের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় একান্তভাবে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে—নারী সমাজ, তথাকথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। হে ভারতের ছাত্র ও তরুণগণ! স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য আজ তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধর; সর্বাগ্রে নিজের অন্তরে এই আলোক জ্বালো, স্বরাজের আদর্শকে সম্যক্ উপলব্ধি কর এবং সেই দীপহস্তে দেশবাসীর দ্বারস্থ হও। চীনা ছাত্রদের মত, রুশ্ তরুণদের মত চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে গিয়া তাহাদের জাগাও। আরও যাও নারী জাতির সমীপে—যাঁহারা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ যাহারা হইয়াছেন 'অবলা'—'উপেক্ষিতা' জনসমাজের কাছে। বল—"ভাই মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য। তোমরা ওঠো, জাগো—এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্য।"

শব্দার্থ: আদর্শ—ভাবধারা। অনুপ্রাণিত—উৎসাহিত। ষড়রিপু—ছয় রিপু (শত্রু)—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আধ্যাত্মিক—ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়। বদ্ধপরিকর—স্থির প্রতিজ্ঞা। সন্যাসে—ভোগবাসনা ও সংসার ত্যাগের ব্রতে। পুরুষকারহীন—পৌরুষহীন। সমন্বয়—সংহতি, মিলন। প্রতিষ্ঠা—প্রভাব। বৈচিত্র্যপূর্ণ—বিভিন্নভাবে পরিপূর্ণ।

নবযুগ—নূতন যুগ। পথপ্রদর্শক—যিনি পথ দেখান। আবর্জনা—নোংরা। আচ্ছাদন—আবরণ (আ+ছাদন—সন্ধি)। আকাঙ্ক্ষা—প্রবল ইচ্ছা। কৃতসঙ্কল্প—স্থির-প্রতিজ্ঞ। প্রকটিত—স্পষ্টপ্রকাশিত। আভাস—ইঙ্গিত। Freedom is the song of the Soul—স্বাধীনতা আত্মার সঙ্গীত। প্রেরণা উৎসাহ। স্বায়ত্ত-শাসন—দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। পরিস্ফুট—প্রকাশিত। সার্বজনীন—সকল লোকের জন্য। পূতিগন্ধময়—পচা গন্ধে পূর্ণ। সম্প্রদায়—জাতি। উপেক্ষিত—অবহেলিত। অবলা—শক্তিহীনা। বসুন্ধরা—পৃথিবী। ভোগ্য—যাহা ভোগ করা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম"—কোন্ আদর্শের কথা লেখক বলিয়াছেন, বুঝাইয়া লেখ।

২। "স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ" বলিতে লেখক কোন্ আদর্শের দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন?

৩। রাজা রামমোহন রায় দেশের নবযুগের প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে কোন্ কোন্ কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন?

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়া লিখ :

(ক) এইভাবে পরিপূর্ণ...... ছুটিয়া আসিল।

(খ) যে স্বাধীন ভারতের......হইতে মুক্ত।

৫। "এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে"—কোন্ বাণী? কাহার বাণী? সে কি আর কখনও শোনা গিয়াছিল?

৬। আজ তরুণ সমাজকে বিশেষ করিয়া যাহা বুঝিতে হইবে তাহা সুভাষচন্দ্রের ভাষায় অবিকল উদ্ধৃত কর।

৭। চলতি ভাষায় রূপান্তরিত কর :

এইভাবে পরিপূর্ণ... ...নূতন কথা। (৮ম অনুচ্ছেদ)

৮। সমাস লেখ ঃ

প্রাণসঞ্চারিণী, অন্তঃসলিলা, বৈচিত্র্যপূর্ণ, কৃতসংকল্প, পুরুষানুক্রমে।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, রাজা রামমোহন।

১৩। নিম্নের পদগুলোকে যথাস্থানে বসাও ও লিঙ্গান্তর কর ঃ

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নদী		
প্রদর্শক		
স্বামী		
মানুষ		
রাজা		
দেশবন্ধু		

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। 'Man-making is my mission'—কাহার উক্তি ? ইহার বাংলা অর্থ কি ?

২। "Freedom is the song of the soul"—কে বলেছিলেন ?

৩। "We want complete autonomy—free from British control"—এ কথা কে কোন্ পত্রিকায় লেখেন ?

৪। Swaraj for the masses"—এই উক্তি কে কোথায় করেন ?

৫। সুভাষচন্দ্র বসু মানব জাতিকে -দেশবাসীকে মুক্ত করিতে হইলে "তিন প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি চাই" বলিয়াছেন।—ঐ তিন প্রকার বন্ধন কি কি ?

বাংলার ব্রত

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখকের কথা ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের তিনি একজন কৃতী সন্তান। তাঁর জন্ম ১৮৭১ খ্রীঃ এবং মৃত্যু হয় ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যেমন বিশ্বজোড়া, শিল্পী হিসাবে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের নাম ঘরে-বাহিরে সম্প্রচারিত। মুখ্যতঃ শিল্পী হলেও অবনীন্দ্রনাথের কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টিও আছে—যার মূল্য কম নয়। তাঁর সকল অভিজ্ঞতাই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে সুন্দর রূপ নিয়েছে। তাঁর বাংলার ব্রত, 'বুড়ো আংলা' 'ক্ষীরের পুতুল', 'আপন কথা' বিখ্যাত বই।

লেখার কথা ঃ তাঁর গদ্য লেখা কলম নিয়ে লেখা, না তুলি দিয়ে আঁকা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তিনিই লিখেছেন, 'অবন ঠাকুর ছবি লেখে'। সহজ সরল ভাষার মধ্য দিয়ে অতি পরিপাটি করে অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ব্রত-কথাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপদক্ষ শিল্পী মানুষের জীবনে, ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র—এঁরা উপাসিত হচ্ছেন ভারতবর্ষে, ইজিপ্তে, মেক্সিকোতে। সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালীর ঘরের জিনিস বলে ধরা যেতে পারে। এটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটি আমরা যখন দেখব। একদিকে ভারতে প্রবাসী আর্যদের অনুষ্ঠান, আর একদিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত। একদল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন, আর একদল নদীমাতৃক

পল্লীগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করেছেন। এই প্রবাসী আর্যদেরই আমরা বলি হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখেছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং তারাই বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে যাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা-স্ফূর্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ এবং পুরাণের চেয়েও পুরানো এই সব লৌকিক ব্রত-অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশে প্রবাসী আর্য এবং আর্যপূর্ব দুইজনেরই সম্পর্ক—যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে; এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা আবদ্ধ—ধন-মান, সৌভাগ্য-স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস। দু'জনে ব্রত করেছে যা কামনা করে, সেটা দেখ্‌লে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান পুরুষদের, আর ব্রত-অনুষ্ঠান মেয়েদের—এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; আর বাঙালী মেয়েরা চাইছেন—'রণে বনে এয়ো হবো, জনে জনে সুয়ো হব, অকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রব্রতী হব।'

বৈদিক সূক্তগুলি আর্য ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দু'জনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি স্বাধীন, বনের সবুজের উপর নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান: আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।

শাস্ত্রীয় ব্রতে প্রায় সকলগুলিতেই, যে কামনা করেই ব্রত হোক না, কামনা চরিতার্থ করিবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া, অনেকটা একই। পুত্র-পৌত্র কামনা—তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র, যে ক্রিয়া সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্দুকের একই চাবি।

মেয়েলী ব্রত যে খাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যত রকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকায়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে 'পূর্ণিপুকুর'—সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল পোঁতা, পুকুরের চারিধারে ফুল সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল ধরান। আবার যখন বৃষ্টির কামনা করে 'বসুধারা ব্রত' তখন আলপনায় আট তারা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছে মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্রচন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুলে ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা আবদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত, সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা করতে চাইছে, এই হল ব্রত—পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরানো সমসাময়িক কিংবা পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।

ভারতবর্ষে বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্যব্রত' বলে। এটা ঠিক যে, আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এই সব 'অন্যব্রত'—ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা কৃষাণ নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, দেবতা-অপদেবতা, কলা-কৌশল, ভয়-ভরসা, হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, সেই আর্য

এবং না-আর্য বা 'অন্ত্যব্রতদের' মধ্যে সব দিক দিয়ে এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতে আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেব-দেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস, ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, কেবল মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে, আমরা সেই সব দিনের মধ্যে পড়ি, যেখানে দেখি আমাদের পূর্বতন পুরুষ 'অন্ত্যব্রতরা' তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন। সব উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর, তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান্ ধাতুস্তর ; আরও তলায় অন্ত্যব্রতদের এই সব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডার।

এই সব অতি পুরাতন ব্রত এখনো কেমন করে বাঙালীর ঘরে ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে,—আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যান নি। সেটা কাল, তার পূর্বে এর তার—আরো পূর্বে যা, আজও তা।—অন্ততঃ বেশির ভাগ মেয়েলী কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির এবং ঠাকুমাতে ও তার ঠাকুমাতে খুব তফাৎ নেই। শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল, বার-অ্যাট্-ল্-র বিয়েও ঠিক সেই ভাবে এখনো ঘটছে। কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য নয়। বাংলার এই ব্রতগুলি আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্ত্যব্রতচারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা—কখনো আল্পনার শিল্পে, কখনো কবিতা, নাটক ও সাহিত্যকলার মধ্য দিয়ে, কখনো বা ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে।

শব্দার্থ ঃ আদিম মানুষের—প্রাচীনকালের লোকেদের। উপাসিত—পূজিত। ইজিপ্তে (Egypt)—মিশরে। ছড়া—গ্রাম্য কবিতা। প্রবাসী—বিদেশে বসবসকারী। অনুষ্ঠান—মাঙ্গলিক কার্য্য। তপোবন—তপস্যার

স্থান। বেদ—ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র—ইহা ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিভাগে বিভক্ত। নদীমাতৃক—বহুনদী আছে এমন। নিষ্পেষিত—দলিত। লৌকিক—সামাজিক। প্রভেদ—পার্থক্য। এয়ো—সধবা রমণী। অকালে—অসময়ে। সূক্তগুলি—বেদের শ্লোকগুলি। চরিতার্থ—সাফল্য। প্রক্রিয়া—পদ্ধতি। দশা বিপর্যয়—অবস্থার পরিবর্তন; অনব্রত—(এখানে) ভারতের আদিবাসী। কৃষাণ—চাষী। দেবতা অপদেবতা—দেবতা ও ভূত প্রেত। মেয়েলী—নারী-সুলভ। গৈরিক—গেরুমাটির রঙ্। গঙ্গামৃত্তিকা গঙ্গমাটি। স্তর—থর। মূল্যবান্—দামী। পুরুষানুক্রমে—বংশ পরম্পরায়। জীবন্ত—সজীব। নাটক—অভিনয়। সাহিত্য কলার—ভাবপূর্ণ চিত্তাকর্ষক কলাকৌশলের।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। বাংলার ব্রত কয় প্রকার? মেয়েলী ব্রতের-উৎপত্তি কিভাবে?

২। 'পুর্ণিপুকুর' ব্রতের বর্ণনাটি নিজ ভাষায় লেখ।

৩। 'অন্যব্রত' মধ্যে তোমার কোন্ কোন্ ব্রত জানা আছে? তোমার জানা কয়েকটি মেয়েলী ব্রতের বর্ণনা দাও।

৪। "সব উপরে…… গোপন ভান্ডার।"—

—এই বাক্যটি কোন্ গদ্যাংশ হইতে উৎকলিত? গদ্যাংশটির লেখক কে? তুমি তোমার নিজের ভাষায় কবিতাটি লেখ।

৫। "ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি"—কথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া লেখ।

৬। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর:

প্রবাসী, নিষ্পেষিত, লৌকিক, পার্থিব, চরিতার্থ, অন্তঃপুর।

৭। প্রতিশব্দ লেখ (কমপক্ষে তিনটি করিয়া):

সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, গঙ্গা, বাসুকী।

৮। টীকা লেখ:

ইজিপ্ত, মেক্সিকো, পৃথিবী, বেদসূক্ত।

৯। এই নিবন্ধে প্রতিশব্দ-সহ কতকগুলি শব্দ একযোগে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ শব্দের তলায় দাগ দাও।

১০। যথাস্থানে পদ বসাও ঃ

একদল		
তপোবন		
প্রবাসী		
বৈদিক		
বিজয়		

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ কোন্ দেশ সূর্য, চন্দ্র ও বায়ুকে উপাসনা করে ?

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বাংলার ব্রত' নিবন্ধে কাহাদের হিন্দুজাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ?

৩। আর্য ঋষিরা কাহাদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন ?

৪। বাঙালী মেয়েরা কাহাদের মত হইতে চাহে ?

৫। কয়েকটি মেয়েলী ব্রতের নাম কর।



দেশবন্ধুর স্মৃতি

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকের কথা ঃ হ্নগলী জেলার দেবানন্দপ্নরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী। ভাগলপ্নরে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্য-জীবন শ্নর্ন হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি ব্রহ্মদেশে যান, দীর্ঘ তেরো বছর কাটিয়ে সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে তিনি 'কুন্তলীন' প্নরস্কার পান। 'শ্রীকান্ত (৪টি পর্ব)', 'শেষ প্রশ্ন', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় কাহিনীকার। তাঁর রচনায় বাঙলার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নিখ্নঁত চিত্র পরিস্ফুট।

লেখার কথা ঃ কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র যোগ দেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনের প্রতি সহান্নভূতি জ্ঞাপন করেন। তর্নণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য নামক সন্দর্ভে তার প্রমাণ মেলে। স্বরাজ আন্দোলনের নেতা দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি তাঁর প্রীতি ও ভক্তি আলোচ্য লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। চিত্তরঞ্জনের প্রতি দেশবাসীর অকৃত্রিম মমত্ববোধ যেমন এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রয়েছে দেশের প্রতি চিত্তরঞ্জনের অকৃত্রিম আকর্ষণ।

মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু

দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন। সেদিন পাটনায় যাইবার পূর্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠালেন। শয্যাগত। আমি কাছে গিয়ে বসিতেই বলিলেন,—এবার শেষ, শরৎবাবু!

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।

তিনি যখন জেলে, তখন জনকয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার যো নাই, আমরা তাই জেলের পাঁচিলে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? দুই চোখ তাঁহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। কয়েক মুহূর্তে তিনি আপনাকে সামলাইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। মিনিট কুড়ি পরে ডাক্তার দাসগুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেছেন শরৎবাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করিতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলল না।

লোকে বলিতেছে, এত বড় দাতা, এতবড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক সর্বপ্রকার কর্মের মধ্যে এত বড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধনসম্পদের মূল্য যে কোনমতেই

উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোকে ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় ব্যারিস্টারি ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছল্ করিয়া ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখি, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নয়, তখন এই আমার ভাল।

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিণ মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গলা দেশে ইংরাজী-বাঙ্গালা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার বিরুদ্ধে গান শুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি তাহার তুলনা নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধে অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটু-খানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তাহলে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশ জ্বল্‌ছে, সেত এক মুহূর্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে দিত।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না। দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটাই হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে আর তিনি, সুভাষ ও আমি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম,

গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে উঠেত তবে থাক্।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু, দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকে জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে। এই সকল কথা বল্‌তে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গালা দেশকে ও বাঙ্গালা দেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করতেন! কিছুতেই যেন তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।

এ কথার আর উত্তর কি? আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বাস্তবিক এতখানি ভাল না বাসিলে এ অপরিসীম শক্তিই বা তিনি কোথায় পাইতেন? লোকে কাঁদিতেছে—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়! একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই! আর আমরা যাহার তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গিয়াছে। যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের

আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার যো ছিল না।

কে নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর এক অর্থ চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনা দোষে এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা দয়া ক'রে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার ক'রে দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ করতে পারব। এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই-এক-একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শব্দার্থ: দেহত্যাগ—মরিয়া যাওয়া। অবিশ্রান্ত—কোথাও না থামিয়া। আহত—আঘাত প্রাপ্ত। পরিশ্রান্ত—ক্লান্ত। ক্ষণকাল—অতি অল্প সময়। স্মরণ করা—মনে করা। অবসর—সুযোগ। অগোচরে—গোপনে। আড়ম্বরহীন—জাঁক জমক শূন্য। আবেদন—প্রার্থনা। অপবাদ—মিথ্যা রটনা। মুক্তকণ্ঠে—জোরের সঙ্গে। আভ্যন্তরীণ—ভিতরের। সমস্বরে—একসঙ্গে সুর করিয়া। সুভাষ—সুভাষচন্দ্র বসু। অহর্নিশ—দিনরাত, সব সময়। বৈঠকখানা—বসিবার ঘর। প্রয়োজন—দরকার। ক্ষুণ্ণ⋯অসন্তুষ্ট। বাস্তবিক—প্রকৃত পক্ষে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। দেশবন্ধুর স্মৃতি-কথায় তাঁহার চরিত্রে কোন্ কোন্ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে?

২। গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধুকে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল? তিনি ঐ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন?

৩। নিম্নের অংশগুলি কোন নিবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? কে ঐ নিবন্ধের লেখক? তিনি কি প্রসঙ্গে কথাগুলি বলিয়াছিলেন? কথাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া লেখ।

(ক) 'তাহলে কি আর·········ভস্মসাৎ করে দিত'।

(খ) 'বাস্তবিক এতখানি········কোথায় পাইতেন'?

৪। শব্দার্থ লেখ:

গুরুভার, অগ্রসর, উপলব্ধি, অন্তরালে, অগোচরে, সদাপ্রসন্ন, আড়ম্বরহীন, প্রত্যুত্তরে অহর্নিশ।

৫। পদ পরিবর্তন কর:

পরিশ্রান্ত, ঐশ্বর্য, দৃঢ়তা, আকৃষ্ট, সঙ্কুচিত, বিরুদ্ধে, পরাধীনতা, আভ্যন্তরীণ।

৬। সমাস নির্ণয় কর:

ঘরে-বাহিরে, শয্যাগত, অগোচর, আড়ম্বরহীন, সবিনয়ে, মেঘাচ্ছন্ন।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

আয়ুষ্কাল, নমস্কার, প্রত্যুত্তরে, দুর্ভাগ্য, মনোমালিন্য, অহর্নিশ, ভাবুক।

মৌখিক প্রশ্ন:

১। 'আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল'—এই বাক্যটি কোন্ প্রবন্ধে আছে? ছেলেটি বল্‌তে কোন্ ছেলেটিকে বোঝাচ্ছে?

২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে কি নামে পরিচিত?

৩। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রীর নাম কি?

৪। 'নন-কো-অপারেশন্' কথাটির অর্থ কি?

৫। দেশবন্ধুর পুরা নাম কি?



কাবুল বাজার

—সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখকের কথা ঃ অধুনা বাংলা দেশের শ্রীহট্ট জেলার ১৯০৪ খ্রীঃ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন আগে ১৯৭৪ খ্রীঃ ঢাকায় তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। দীর্ঘদিন তিনি রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ছিলেন, তারপর কর্মোপলক্ষে দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। একাধিক ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। আটপৌরে মুখের কথা দিয়ে যে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর তুলনা নাই ; এক বিশেষ ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করে এ কাল-জয়ী সাহিত্যিক নিজেকে অমর করে রেখে গেছেন। তাঁর দেশ-বিদেশে, হিটলার, শবনম, অভিজ্ঞতাপুষ্ট মননধর্মী সাহিত্য।

লেখার কথা ঃ পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আলী সাহেব যে বর্ণপ্রখর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। প্রখর অথচ রসজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রতিটি জিনিসকে অবলোকন করেছেন এবং রস-সম্পদের প্রলেপ দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশের ভঙ্গীটিও যথেষ্ট মনোজ্ঞ। সত্যি বলতে কি, এই রচনাধর্মী লেখায় মুজতবা আলীর তুলনা নেই। "কাবুল বাজার" একটি বর্ণনাধর্মী রচনা সাহিত্য।

কাবুলের একটি দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশ্মীর পুরানো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুক উঁচু ছোট ছোট খোপ, পানের দোকানের দুই বা তিন ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা

দখল করেছে। কোন কোন দোকানে বাক্সের ডালার মত কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানের নীচের আধখানা বন্ধ করা যায়।

বুকের নীচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা আরো কিছু নীচে দোকানেরই একতলা গুদামঘর অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে-কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশোয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীর ভাগ লোকেরই কাজকর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে ব'সে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নীচের অথবা সামনের দোকানের একতলার মুচি পয়জারে গোটা কয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে দোকানে বসলে কিছু একটা কিন্‌তে হয়। আদপেই না। জিনিস-পত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। এমন কি কলিকাতা থেকেও কাবুলীদের এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখানে এই আরাম-দায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে। সুখ-দুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো ক'রে জমিয়ে নিতে হয়।

* * *

কাবুলের বাজার পেশোয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম ক'রে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভূষা, চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচা-কেনা করে। হাজরা, উজবেগ (বাঙ্‌লায় উজবুক), কাফিরিস্থানী, ফিজিলবাশ, মঙ্গোল, কুর্দ—এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা রাইডিং বুট্ দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুষ না দরাজ হাত,—চট ক'রে ব'লে দিতে পারে।

এইসব পার্থক্য স্বীকার ক'রে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেন-দেন করার সময়ে কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—তু'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ীতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোক-যাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার ক'রে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডর-ভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা গাধা-ঘোড়ার পিঠে ব'সে ভাঙা ভাঙা ফার্সীতে দরদস্তুর করছে, বুখারার বড় কারবারী ধীরে-গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমন ভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকি দিনটা এখানেই বেচা-কেনা, চা-তামাক পান ও আহারাদি ক'রে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুকা-কল্কি-সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে ঘোড়া বোঝাই বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহরবান্, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলের আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটি খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, "ও বাচ্চা, চা-ওয়ালাকে বল তো আরেক প্রস্থ চা দিতে যেতে।"

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ্, কত চিত্রবিচিত্র নক্শা, মোলায়েম স্পর্শসুখ! কার্পেট শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রীত হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতর বহু গোত্র, বহু বর্ণ,

জন্মভূমি, রঙ্-নক্‌শা মিলিয়ে সরেস-নিরেস মালের বাচ-বিচার হয়। বিশেষ রঙের নকশা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়—সে মালের সস্তায় জিনিষ হয় না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটো জিনিষের মধ্যে ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকী বিলাতী আর জাপানী কলের তৈয়ারী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

* * *

বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নামাজের পর সমস্ত মধ্য-প্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকলে মূল চৈতন্ত-বোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট্ প'রে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সবাই চত্বরে নাচ্‌তে আরম্ভ করে। বুটের ধমক তোলে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত ক'রে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোল-সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নীচু ক'রে দেয়, আর কাণের দু'পাশের বাবরীচুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে শূন্যে দু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে আর দু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে, মাথা পিছনের দিকে ঠেলে, বাবরীচুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দু'হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত ক'রে ঘূর্ণি-হাওয়ার চর্কিবাজি। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার দেখ্‌বেন এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা ক'রে সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কাণের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার

সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিশের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী, মক্কা-মদিনা তীর্থের গল্প ব'লে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুন্‌ছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে।

শব্দার্থ ঃ—দ্রষ্টব্য—দর্শনীয়। ডবল (Double)—দ্বিগুণ। হপ্তায়—সপ্তাহে। আদপেই—মোটেই, আসলে। পায়জার—চটিজুতা। গদ্দাই লস্করী—অতি ধীর। লোপ—বিনাশ। পলিটিক্স—(Politics)—রাজনীতি। পুস্তিন—আফগানিস্থানের এক প্রকার পোষাক। জোব্বা—বুক খোলা ও হাটু অবধি লম্বাঢিলে জামা বিশেষ। রাইডিং বুট্‌ (Riding Root) পাহাড়ে উঠিবার জুতা বিশেষ। নির্বিকারে—বিকারহীন বা ভাবলেশহীন ভাবে। চিত্তে—হৃদয়ে, অন্তঃকরণে। সওদা—খরিদ, ক্রয়। আহারাদি—খাওয়া দাওয়া। কার্পেট (Carpet)—গালিচা। মেহেরবান্‌—দয়ালু। রসুল—ঈশ্বরের দূত। স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত সুখ। পঞ্চেন্দ্রিয়—পাঁচ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক)। চত্বরে—প্রাঙ্গণে। উৎক্ষিপ্ত—উর্দ্ধে নিক্ষিপ। পীর দরবেশ—মুসলমান সাধু। মজলিশ্‌—বৈঠক, আসর। আল্লার—খোদার। করুণা—দয়া।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। কাবুল বাজারের একটি দোকানের এবং দোকানদারের আচরণের বর্ণনা দাও।

২। কাবুল কোথায়? কাবুলের বাজারের একটি বিবরণ দাও। প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ ঐ বাজারে বেচা-কেনা হয়?

৩। এই নিবন্ধ হইতে কাবুল বাজারের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের চরিত্র ও আচরণের কি আভাস পাইলে?

৪। পরিচয় দাও ঃ

আল্লারসুল ও হাফিজ।

৫। 'চিৎপুরের শালওয়ালা······বজায় রেখেছে।'

—এই কথাগুলি কোন্ প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি উত্থাপন করিয়াছেন? কোন্ ঐতিহ্যের কথা এখানে বলা হইয়াছে লেখ।

৬। একটি করে বাংলা প্রতিশব্দ দাও:

পয়জার, রেওয়াজ, লেনদেন, পুস্তিন, দাওয়াত, মোলায়েম, মজলিশ।

৭। শূন্যস্থানে কথা বসাও:

(ক) কাবুল বাজারে কেনবার মত তিনটি ভালো জিনিস আছে, —, — আর —।

(খ) আপনি হয়তো ভাবছেন যে — বসলে কিছু একটা কিনতে হবে। — না। বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই — নয়।

(গ) কাবুলের একটি দ্রষ্টব্য তার —।

(ঘ) কাবুলের বাজার পেশোয়ারের চেয়ে অনেক — কিন্তু অনেক বেশী।

মৌখিক প্রশ্ন:

১। কোন্ কোন্ স্থানের পুরাণো বাজার বিখ্যাত?

২। কাবুলী ব্যবসাদারদের বৈশিষ্ট্য কি?

৩। কাবুলের কোন্ জিনিস বিখ্যাত?

৪। কার 'গজল গান' জগৎ-প্রসিদ্ধ?

৫। মক্কা-মদিনা কাদের তীর্থস্থান?



ভারতের জাতীয় আন্দোলন

অমরনাথ রায়

লেখকের কথা ঃ প্রখ্যাত প্রবন্ধ-রচয়িতা। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নানা বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি সাহিত্যগুণে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যথেচ্ছগতি ; জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের ভারে সেগুলো জরাজীর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সমাজ-তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলো বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের ইতিহাসেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।

লেখার কথা ঃ আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি কোন হঠাৎলব্ধ বস্তু নয়—দিনে দিনে প্রচেষ্টার সোপানে এই স্বাধীনতার পটভূমি রচিত হইয়াছে। নানা বাধা-সংঘাত পথ রুখে দাঁড়িয়েছে—মানুষ জীবন দান করেছে, শহীদ হয়েছে, সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি শতবর্ষের অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রচারের ফসল হলো আমাদের স্বাধীনতা। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেখক গভীর পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হল। পলাশীর আমবাগানে সেদিন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা গেলেন হেরে। জয় হল বিদেশী ইংরেজদের। তারপর বুদ্ধিমান্ ইংরেজ জাতি ধীরে ধীরে ছলে-বলে-কৌশলে বাংলার শাসনভার হস্তগত করল। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে তারা সমগ্র ভারত জয় করে ভারতের অধীশ্বর হয়ে বস্ল।

ইংরেজ শাসকদের শাসনব্যবস্থা ভারতবাসীদের মনঃপূত হয়নি।

ভারতবাসী সহ্য করতে পারেনি ইংরেজের নির্যাতন ও অপমান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড গণ-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় খণ্ড-বিদ্রোহ বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক অতি সহজেই সে-সব বিদ্রোহ দমন করেছিল।

জাতীয় জাগরণের পরবর্তী পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহকে বলা হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। শুরু হল বারাকপুরে—সেখান থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। ইংরেজ কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করল। এই বিদ্রোহের সময়েই ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রাণ হারালেন। বিঠুরের নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হল। শেষ মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ বর্মায় নির্বাসিত হলেন। ব্যর্থ হল সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু হাজার হাজার শহীদের আত্মদান ব্যর্থ হল না। তা ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশাত্ম-বোধ জাগিয়ে তুলল।

এরপর ১৮৫৯-৬০ সালে শুরু হলো 'নীল আন্দোলন'। সেকালে এদেশে নীল চাষ হত। নীলচাষ করবার জন্যে নীলকর সাহেব ও কুঠিয়ালরা কৃষকদের উপর অত্যাচার করত। তার-ই বিরুদ্ধে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ—'নীল-বিদ্রোহ'। এদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাদ্রী লং সাহেবের কারাদণ্ড হল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। মামলা শুরু হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। সারা দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করলো। তখন লোকের মুখে মুখে শোনা গেল :

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার,
অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

সুচতুর ইংরেজ শাসক নীল-আন্দোলনও দমন করলো। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত আরও প্রবল বেগে বইতে লাগল।

এই সময় দেশবাসীকে জাতীয়তা-বোধে দীক্ষা দিতে লাগলেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। দেশের সংবাদ-পত্রগুলিও দেশের আন্দোলন গড়ে তুল্‌বার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। দেশের কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিকেরা জাতির মানস-পটে দেশমাতার চিন্ময়ী রূপটি তুলে ধরলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইস্‌লাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই মিলে একজোটে দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন,—'ওঠ, জাগো, পরাধীনতার শৃংখল ভাঙো'। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ আহ্বান ধ্বনিত হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র জাতির প্রাণে দেশপ্রেমের নূতন উন্মাদনা জাগালো।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। কয়েক বছর বাদেই, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দিলে। ফলে দেশের মরা মানুষ যেন বেঁচে উঠ্‌ল। বিভক্ত বাংলাকে এক করবার জন্য তারা আন্দোলনে মেতে উঠ্‌লো। জাতি স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিল, বিদেশীদ্রব্য বর্জন করার শপথ নিল। ইংরেজ শাসকরা তাতেও টলল না। তখন দেখা দিল বিপ্লববাদ; ভারতে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল।

মজঃফরপুরে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ভুলবশতঃ দুইজন ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশে ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন ক্ষুদিরাম বসু, তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কলকাতার মাণিকতলা বাগানে বিপ্লবীরা বোমা, বন্দুক, কার্তুজ ইত্যাদি তৈরির কারখানা গড়েছিলেন। তাদের দলের প্রায় সবাই ধরা পড়লেন। এমনি ভাবে যখন গুলিগোলা চল্‌তে লাগ্‌ল, তখন ইংরেজদের হুঁস হল। তারা বুঝল, ভারতবাসীর এ অসন্তোষ আর জিইয়ে রাখা ঠিক হবে না। ইংরেজ শাসক তখন বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন। সেটা ১৯১১ সাল।

এরপর জাতির আন্দোলনের পুরোভাগে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অহিংস আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালে। বাংলায় তখন জোর বিপ্লববাদ। বিপ্লবীদল রুখে দাঁড়িয়েছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বাংলার লাট্‌ এনড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছেন বিপ্লবীদল। বালেশ্বরে বাংলার বীরসন্তান বাঘা যতীন ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সহযোগীদের সাথে প্রাণ দিয়েছেন। ভারত ব্রিটিশ-শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত। হাজার হাজার মানুষ জেলে আটক। গান্ধীজী ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জন-সাধারণ বৈশাখী মেলা দেখ্‌তে এসেছিলেন। তাঁদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালালো ইংরেজ সৈন্য। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল বহু ভারতীয়কে।

১৯২০ সালে গান্ধীজী আরম্ভ করলেন 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'আইন অমান্য আন্দোলন'। সর্বক্ষেত্রে ইংরাজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে শাসন-যন্ত্র অচল করে দেওয়াই তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। কোটি কোটি ভারতবাসী গান্ধীজীর অনুগামী হলেন! তাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরু অন্যতম।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। দেশবাসীর মতামত না জেনেই তখনকার বড়লাট ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেল্‌লেন। দেশে আবার প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। শুরু হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৯৪২ সালের এই গণ-আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল। নাম তার 'আগষ্ট আন্দোলন'। ঐ সময় সুভাষচন্দ্র বসু আত্মগোপন করে আফগানিস্থান ও রাশিয়ার পথে জার্মানীতে চলে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন জাপানে। অতঃপর তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বর্মার ভিতর দিয়ে সেই ফৌজ নিয়ে ভারত সীমান্তে উপস্থিত হলেন নেতাজী। 'জয়-হিন্দ' ধ্বনিতে ভারতসীমান্ত মুখরিত হল।

ইংরাজ শাসকেরা তখন প্রমাদ গুণলেন। লণ্ডন থেকে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস ছুটে এলেন ভারতে দৌত্যগিরি করতে। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবী করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কংগ্রেস 'ভারত বিভাগে' রাজী হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সোনার ভারত ভেঙে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া হল—ভারত আর পাকিস্তান। আর সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'সিপাহী বিদ্রোহ' কখন সংঘটিত হয়? ঐ বিদ্রোহের শেষ পরিণতি কি হয়?

২। ১৮৫৯-৬০ সালের নীল আন্দোলনের বিষয় যা জান লেখ।

৩। নীল আন্দোলন দমনের পর দেশে জাতীয় আন্দোলন কি ভাবে পরিচালিত হল?

৪। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় কবে? লর্ড কার্জনের বাংলাদেশকে ভাগ করার ফলে দেশে কি অবস্থার উদ্ভব হল?

৫। জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে মহাত্মা গান্ধী আসার পর থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপটি নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৬। পরিচয় দাও ঃ

সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, বন্দেমাতরম্, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন।

(ক) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) 'নীল বাঁদরে……বাঁচানো ভার।'

(খ) '১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট……পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল।'

৮। শব্দার্থ লেখ ঃ

অধীশ্বর, আত্মবলিদান, প্রতিবাদ, আলোড়ন, দেশাত্ম-বোধ, চিন্ময়ী উন্মাদনা, স্বাদেশিকতা, সত্যাগ্রহ, পরিসমাপ্তি।

৯। ঠিক উত্তর রেখাঙ্কিত কর ঃ

(ক) উল্লেখ করার যোগ্য—উল্লেখ্য/উল্লেখযোগ্য (খ) নাটক রচনা করেন যিনি—নাট্যকার/নট (গ) নিজেকে গোপন রাখা—আত্মগোপন/আত্মদান (ঘ) সন্তোষের অভাব—অসন্তোষ/সন্তোষাভাব।

১০। বাক্যগুলিকে যথার্থ স্থানে সংযোজন কর।

পলাশীর আমবাগানে	কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ।
১৯৩৯ সালে	সিরাজউদ্দৌলা গেলেন হেরে।
কোটি কোটি ভারতবাসী	তখন বঙ্গভঙ্গ রদ করল।
তারই বিরুদ্ধে দেখা দিল	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।
ইংরেজ শাসক	গান্ধীজীর অনুগামী হলেন।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কত সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়? ২। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সারির কয়েক জন নেতার নাম কর। ৩। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট্' সম্বন্ধে কি জান? ৪। কত সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়? ৫। কোন্ সালে আগষ্ট বিপ্লব হয়?



সাজাহান
(নাট্যাংশ)

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

লেখকের কথা ঃ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়ঃপরিধি ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজের দেওয়ান ছিলেন। পিতার বিদগ্ধ পরিবেশ তাঁর মনোজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এম. এ. পাশ করার পর তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেত যান, ফিরে এসে সরকারী চাকরীতে যোগ দেন। অল্প বয়স থেকে তাঁর কাব্য-চর্চা শুরু হয়—পরে নাটক রচনায় তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে খ্যাতি লাভ করেন।

লেখার কথা ঃ নাট্যাংশটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের অংশ বিশেষ—এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক। মুঘল সম্রাট্ সাজাহানের জীবনের শেষ পর্যায়ের মর্মান্তিক পরিণতি এ নাটকের বক্তব্য বিষয়। পিতৃস্নেহাতুর জাহানারার চরিত্রও আলোচ্য অংশে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত। অসহায় বৃদ্ধ সম্রাটের মর্মান্তিক আক্ষেপ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণময় লেখার স্পর্শে অতি জীবন্ত ও প্রাণময় হয়ে উঠেছে এই আলোচ্য অংশে।

সাজাহান—আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা? আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক। মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা!

জাহানারা—বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে আনি। কিন্তু কি করব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না।

সাজাহান—বল। আর কি ?

জাহানারা—বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান—ধরা পড়েছে ?—কি রকমে ধরা পড়ল ?

জাহানারা—জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান—জিহন খাঁ !—জিহন খাঁ !—কি বল্‌ছিলে জাহানারা, জিহন খাঁ ?

জাহানারা—হাঁ বাবা।

শুনলাম, পরশু দারা আর তার পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতির পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তাদের পরিধানে ময়লা সাদা কাপড়। তাদের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান—তবু তাদের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্তে ছুট্‌লো না ? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে দেখ্‌লো ! তারা কি পাষাণ।

জাহানারা—না বাবা ! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তারা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়াকরা বন্দুকগুলো দেখে তারা সব ত্রস্ত, একটা, যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ ; কেউ মাথা তুল্‌তে সাহস করছে না। কাঁদ্‌ছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখ্‌তে পায় !

সাজাহান—তারপর ?

জাহানারা—তারপর ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে রেখেছে।

সাজাহান—আর সিপাপ আর জহরৎ ?

জাহানারা—সিপার তার পিতার সঙ্গ ছাড়েনি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান—ঔরংজীব এখন দারাকে কি করবে জানিস ?

জাহানারা—কি করবে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান—কি জাহানারা! শিউরে উঠিল যে!

জাহানারা—যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান—কি-কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! তা—তাকি সম্ভব! ভাই ভাইকে হত্যা করবে!

জাহানারা—চুপ! ও কার পদশব্দ! শুন্‌তে পেয়েছে।—বাবা আপনি কি করলেন! কি করলেন!

সাজাহান—কি করেছি?

জাহানারা—ও কথা উচ্চারণ করলেন!—আর রক্ষা নেই।

সাজাহান—কেন?

জাহানারা—হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা করত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আসতো না। কিন্তু আপনি সে কথা তাকে মনে করিয়ে দিলেন! কি করলেন! কি করলেন! সর্বনাশ করেছেন!

সাজাহান—ঔরংজীব ত এখানে নেই! কে শুনছে?

জাহানারা—সে নেই, কিন্তু দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আপনি ভাবছেন যে এ আপনার প্রাসাদ? না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়। ভাবছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। এ প্রদীপ নয়, এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি। এ প্রাসাদে এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার-আমার একজনও বন্ধু আছে ভেবেছেন! বাবা? না নেই! সব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল! ঐ কার ছায়া?

সাজাহান—কৈ?

জাহানারা—না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা?

সাজাহান—দেবো লাফ?

জাহানারা—সে কি বাবা ?

সাজাহান—দেখি যদি দারাকে রক্ষা করতে পারি। —তাকে তারা হত্যা করতে যাচ্ছে। আর সেখানে আমি নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়, চোখের উপরে এই সব দেখ্‌ছি অথচ খাচ্চি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু করছি না। দেই লাফ !

জাহানারা—সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু।

সাজাহান—হলোই বা ? দেখি যদি বাঁচাতে পারি—যদি পারি।

জাহানারা—বাবা আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন ! মরে গেলে আর দারাকে রক্ষা করবেন কি করে ?

সাজাহান—তা বটে ! তা বটে ! আমি মরে গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে ? ঠিক বলেছিস্। তবে ! তবে !—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌নে জাহানারা ?

জাহানারা—না বাবা, সে আসবে না।

শব্দার্থ -সাজাহান—দিল্লীর সম্রাট। জাহানারা—সাজাহানের কন্যা। দুঃসংবাদ—খারাপ খবর। বাকি—অবশিষ্ট। দারা—সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পরাজিত হয়ে—হেরে গিয়ে। সুজা—শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। সপরিবারে—পরিবারের সকলের সহিত। মোরাদ—সাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র। বন্দী—আটক। দুঃসংবাদের বস্তা—বস্তা ভর্ত্তি খারাপ সংবাদ—অর্থাৎ রাশি রাশি দুঃদায়ক খবর। কঙ্কালসার—অস্থি চর্ম সার—অর্থাৎ খুব কৃশ বা রোগা। প্রদক্ষিণ—ঘুরানো। উদ্ধার করিতে—ছাড়িয়ে আন্‌তে। উত্তপ্ত—গরম, উষ্ণ। জঘন্য—অত্যন্ত খারাপ, একান্ত নিকৃষ্ট। পিতার সঙ্গ ছাড়েনি—পিতাকে ত্যাগ করে চলে যায় নি। জহরৎ—দারার কন্যা। অন্তঃপুরে—মহিলা বা মেয়েদের মহল বা থাকার জায়গা। শিউরে উঠলে যে—চমকে উঠ্‌লে যে। পদশব্দ—পায়ের শব্দ বা আওয়াজ। উচ্চারণ করলেন—বলে ফেল্‌লেন। জহ্লাদ-দৃষ্টি হত্যাকারীর বিকট ভ্রূকুটি। যোগ দিয়েছে—একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। বন্ধু

—মিত্র, সখা বা আপনার জন। নিরূপায়—উপায়হীন। নারীর মত—স্ত্রী-লোকের ন্যায়। জ্ঞান—সংজ্ঞা। বাঁচাবো—জীবিত রাখবো। হারিয়েছেন—লোপ পাইয়াছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা' ?—একথা কে বলেছেন ? এই কথা বলার প্রসঙ্গে বক্তা কোন্ কোন্ দুঃসংবাদের কথা উল্লেখ করেছেন ?

২। জাহানারা দারা আর তার পুত্রের কোন্ শাস্তির কথা বলেছেন ? এই শাস্তির বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌তে সাহস করে নি কেন ?

৩। 'ঔরংজীব ত এখানে নেই। কে শুনছে' ?—সাজাহানের এই কথার উত্তরে জাহানারা যা বলেছেন তা হুবহু উদ্ধৃত কর।

৪। এই নাট্যাংশ পড়ে সাজাহানের পুত্রস্নেহের যে পরিচয় পাও তা নিজ ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

৫। "তাকে তারা হত্যা······কিছু করছি না"।

—এ কথা কে, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিলেন ? বক্তার মনের দুঃখ ব্যাখ্যা ক'রে লেখ।

৬। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ

দুঃসংবাদ, দুর্ভাগ্য, প্রদক্ষিণ, জঘন্য নিরুপায়।

৭। অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর।

দ্বারা, দারা ; প্রসাদ, প্রাসাদ ; নারী নাড়ী ; দৃষ্ট, দৃশ্য।

৮। প্রতিশব্দ লেখ ঃ

পৃথিবী, বাতাস, গৃহ, হাতি, মাথা, পিতা।

৯। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) 'হয়ত ঔরংজীব **দারাকে** হত্যা করত না।'

(খ) 'দারা আবার পরাজিত হয়ে **বাখরের** দিকে পালিয়েছে।'

(গ) '**পৃথিবীর** কি অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে ?'

১০। নাট্যাংশটি ভালভাবে পড়ে কোন্‌টা কার উক্তি ঠিক করে বল।

সাজাহান—
জাহানারা—

ক) 'জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।'
(খ) 'পৃথিবীর কি অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে?'
(গ) 'ও কথা উচ্চারণ করলে। আর রক্ষা নেই।'
(ঘ) দেবো লাফ?
(ঙ) 'এ প্রদীপ নয়, এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি।'

১১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—
(ক) ভাবছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজেবের — নিশ্বাস।
(খ) আমিই আপনার নিকট রোজ রোজ — বস্তা বহে আনি।
(গ) কেবল — মত ঘাড় উঁচু করে দেখলে।
(ঘ) পাষাণও — হয়।
(ঙ) ভাই ভাইকে — করবে?
(চ) তা বটে, আমি — গেলে দারাকে কি করে।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—

১। 'সাজাহান' নাটকটি কার লেখা?

২। সাজাহান ইতিহাসে সম্রাট ছাড়া আর কি হিসাবে ভারতবাসীর নিকট বিশেষভাবে পরিচিত?

৩। সাজাহান নাট্যাংশটি পড়ে কাকে ভাল লাগল?—জাহানারা, ঔরংজীব, সাজাহান, দারা।

৪। ঔরংজীব-এর চরিত্রের কি কি দোষ তোমার দৃষ্টিগোচর হ'ল?

৫। এই নাট্যাংশটি পড়ে কোন্ পুত্রের উপর সাজাহানের বেশী স্নেহের পরিচয় পেলে?



লেখার কথা ঃ জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম গল্প 'মার্জনা' কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশ পায়। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, স্মৃতি-কথা, সকল রকম লেখাতেই তাঁর দক্ষতা আছে। সর্বাঙ্গীন চরিত্র-চিত্রণের চাইতে চরিত্রের ক্ষণিক নিরূপণে তাঁর দক্ষতা বেশী। ঘাত-প্রতিঘাতময় বর্ণনাতেও তাঁর যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। ভ্রমণ-কাহিনী রচনাতেও তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ। 'আঁকাবাঁকা', 'প্রিয়বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে' ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

লেখার কথা ঃ বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে প্রবোধ সান্যাল অন্যতম। তাঁর খ্যাতির নিদর্শন আলোচ্য কাহিনীতেও বর্তমান। কেদারনাথ হিমালয়ের দুর্গম শিখর-শীর্ষে অবস্থিত। প্রতি বছরই হাজার হাজার লোক কেদারনাথের পথে পাড়ি জমায়। এখানে সে কাহিনীকেই অনাড়ম্বর অথচ নিখুঁত ভঙ্গিতে লেখক চিত্রিত করেছেন। স্পর্শকাতর লেখক সকল কিছুকে যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনি স্পষ্ট স্বচ্ছ ভাবে তাকে প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছেন—এইখানেই প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের কৃতিত্ব।

আকাশে ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! শোনা গেল বৎসরে কোন কোন দিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে কোলে মেঘ ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়ছে না, মাতালের মতো ছন্দহীন হয়ে চলেছি। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইচ্ছা করচে ছুটোছুটি করি। চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধচে, লাঠিটা বাগিয়ে

ধরতে পারচিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ দীর্ঘ লম্বা চড়াই নয়, গোলকধাঁধাঁর মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠ্‌চি। বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্চে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠ্‌তে থাকি। আজ আমি আগে আগে। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহ-হীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা। পথের ধারে ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝরনাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়চে।

ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠলো। সে-আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎ বহ্নির নয়—সে এক নূতন অলৌকিক আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোর ধাঁধা। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এলো, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সংকীর্ণ পথ-রেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁট্‌চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠলো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষারবৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা-দানা জল। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ! আর বুঝি আত্মরক্ষা হ'ল না। আর কতদূর আছে কে জানে! —মন্দির আর কতদূর? মাথার উপরে বরফ, কাঁধে পড়চে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুল্‌তে পারচি নে, পাগলের মত ছোট্‌বার চেষ্টা করলাম।

শংখধ্বনি শুন্‌চি। কাঁসরঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আস্‌ছে। কোন্‌দিকে? উত্তরে না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুন্‌লাম। কিন্তু আর যে চলতে পারচিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেব? কিন্তু শুলেই যে থাম্‌তে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি, সব ডুব দিচ্চে রূপ, আলো, শব্দ চেতনা,

নিঃশ্বাস—সব। একবার চীৎকার করে কাঁদ্‌তে পারিনে? একবার পারিনে ঝড়ের মত হেসে উঠ্‌তে?

"মহারাজ-জী, কেঁও খাড়া হুয়া হ্যায়?" হাতের উপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে উঠ্‌লাম। হাতটা ধরে হিড় হিড় করে কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটি বল্‌লে, "এ্যায়সা হোতা হ্যায় ঠাণ্ডামে, জল্‌দি আও—"

"কোন্ হ্যায় তুম্; ছাড়ো ছাড়ো—"

"আও জী আঁখ খুলো ম্যায় অমরা সিং হ্যায়। আও পুল, আ'গে।" অমরা সিং আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌লো।

তখন মন্দাকিনী দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেছি। কাঁসরঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্চে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু' একটি দোকান, পথগুলি পাথর বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথ-ঘাট সমস্ত কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা, তার উপর দিয়েই আনাগোনা চল্‌চে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সরে গেচে, এবার তেমন কষ্ট হচ্ছে না। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙ্গুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরচে, পায়ের চামড়া ফেটে গেচে। তা যাক, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান্ মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জন কয়েক অর্ধ-উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলোট-পালট খাচ্ছে। কেদারনাথ মূর্তিমান্ নন; কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড। তা হোক, তাকেই

আলিঙ্গন করে কেউ হাস্‌ছে, কেউ কাঁদ্‌চে, কেউ চীৎকার করচে, কেউ ধরচে গান, কেউ করচে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি। আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ, কিন্তু স্থানু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল। ভিতরটার কালিবর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই ; সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করচে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা দিয়ে বার হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্ছে, নেমে এসে কোনক্রমে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চল্লাম। মুখে একরকম শব্দ করতে করতে এসে ধর্মশালায় উঠ্‌লাম।

ছোট্ট পাথরের ঘরখানি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে রয়েচে। ভিতরে আমরা কয়েকজন যাত্রী। কম্বল জড়িয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌চি, কারো মুখে আর কথা নেই, চোখে ও মুখে সকলেরই প্রাণ-ভয়ের চিহ্ন। বাইরে মেঘলা আকাশ, প্রতিনিয়ত তুষার ঝরে পড়চে। কোনো কোনো স্থানীয় লোক লোহার অস্ত্র নিয়ে বরফ কেটে আপন চলাচলের পথ সুগম কর্‌চে।

এমন সময় অমরা সিং কতকগুলি কম্বল আর কাঠ এনে হাজির করল। পাণ্ডারা এদেশে বিনামূল্যে কম্বল ধার দিয়ে যাত্রীদের সাহায্য করেন, কাঠও তাঁরা কিছু এমনিই আনিয়ে দেন। অমরা সিং একটা লোহার খাপ্‌রায় কাঠের আগুন জ্বাল্‌লো। আগুন দেখে আমাদের কী আনন্দ! ও যেন মৃতসঞ্জীবনী, ও যেন আমাদের সকলের লু[illegible] পরামায়ু। কাঠ এত ঠাণ্ডা যে ভালো করে জ্বল্‌তে চায় না, তবু সেইটুকু আগুনের চারিদিকে যাত্রীরা গিয়ে বস্‌লো। কেউ তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় ; কেউ দেয় পা। হাত-পা পুড়ে যাক, ছ্যাকা

লাগুক, গ্রাহ্য নেই। আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝুটাপটি, আগুন নিয়ে মনোমালিন্য। কোমরভাঙ্গা চারুর-মা এতক্ষণ ঠাণ্ডার জ্বালায় কম্বলরাশির তলায় আত্মগোপন করেছিল, একবার হঠাৎ একখানা কম্বল হাতে নিয়ে উঠে পাগলের মতো আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। দিল কম্বলখানা আঙ্‌রাগুলি মধ্যে ঢুকিয়ে। একটি রোঁয়াও তার পুড়লো না, বামুন-বুড়ি হাঁ-হাঁ করে উঠ্‌তেই সে আবার সেখানা তুলে নিয়ে উঁচুতে ধরে কিয়ৎক্ষণ তাতালো, তারপর আবার এলো এগিয়ে। কাঠের মতো কঠিন ও নিশ্চল হয়ে এতক্ষণ একপাশে আমি বসে ছিলাম, চারুর-মা হঠাৎ সেই গরম কম্বলখানা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। বললে—সব আগুনটুকু ওরা চেটে খাচ্ছে, তুমিও যে একটা মানুষ তা আর ওদের……কম্বলখানা একটুও গরম হয়নি, হ্যাঁ বা'ঠাউর ? বলেই সে আবার সেই কম্বলরাশির তলায় গিয়ে ঢুক্‌লো।

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হয়ত ছিল, কিন্তু শক্তি ছিল না। শুধু কেবল শীতকাতর মুখখানা ফিরিয়ে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার দিকে তাকালাম।

শব্দার্থ : কেদারনাথ—উত্তরপ্রদেশের তেহ্‌রি গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। খ্যাতনামা—প্রসিদ্ধ। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—বেড়ানোর গল্প। দুর্গম—যেখানে যাওয়া কষ্ট। অবলুপ্ত—যাহা ঢাকিয়া গিয়াছে। কুহেলিকা—কুয়াশা। উদ্দীপনা—উৎসাহ। আচ্ছন্ন—ঢাকা (আ+ছন্ন—সন্ধি)। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া। উপবিষ্ট—আসীন। পরম—অত্যন্ত। রূপবান্—সুন্দর, মেঘের ঘনঘটা—মেঘের আড়ম্বর। সঙ্কীর্ণ—সরু। উগ্রতা—প্রখরতা। পল্লব—পাতা। নীরবতায়—নিস্তব্ধভাবে। কৃতজ্ঞতা—উপকার স্বীকার।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'কেদারনাথের পথে' প্রবন্ধে লেখক যে পথের বর্ণনা দিয়েছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। কেরারনাথের মন্দির দর্শনের পর লেখকের অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। কেদারনাথে থাকাকালীন ধর্মশালায় লেখক যে-সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময় কাটিয়েছিলেন তার একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন কর।

৪। 'সে আলো আকাশের নয়'—আর কিসের আলো নয় বলে লেখক বলেছেন? আলো আসলে কিসের?

৬। ছোট্ট পাথরের ঘরখানি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে রয়েচে।'—কথাগুলি কোন প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে? কথাগুলি কে, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন? কথাগুলি ব্যাখ্য করে লেখ।

৬। 'কৃতজ্ঞতা জানাবার……তাকালাম'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর।

৭। শব্দার্থ লেখ ও পদ নির্ণয় কর ঃ

অবলুপ্ত, তীক্ষ্ন, পটভূমিকায়, অলৌকিক, মূর্তিমান্, আর্তস্বর, প্রাণান্তকর, প্রতিনিয়ত, মৃতসঞ্জীবনী, মনোমালিন্য, কৃতজ্ঞতা।

৮। নিম্ন অংশটি সাধুভাষায় রূপান্তর কর ঃ

'এমন সময় অমরা সিংহ……আগুন নিয়ে মনোমালিন্য।'

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কেদারনাথে কোন্ দেবতার মন্দির অবস্থিত?

২। 'দুধগঙ্গা' কোথায় অবস্থিত?

৩। কেদারনাথ তীর্থে পাণ্ডারা যাত্রীদের কোন্ কোন্ জিনিস বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন?

৪। 'এ্যায়সা হোতা হ্যায় ঠাণ্ডামে,—এ কথাগুলি কে, কাকে বলেছিলেন? ঠাণ্ডায় সেখানে কি হয়?

৫। 'কেদারনাথের পথে' প্রবন্ধে অমরা সিং এবং এক বৃদ্ধার বদান্যতার মধ্যে কার বদান্যতা তোমার বেশী ভাল লাগে?



বৈজ্ঞানিক সাধনা

—জগদীশচন্দ্র বসু

লেখকের কথা ঃ জগদীশচন্দ্র বসু একজন প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্ ও বিজ্ঞানী। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়। প্রথমে ফরিদপুর ও পরে কলিকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বিলেত যান—সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স বি. এস্-সি, ডি. এস্-সি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। দেশে এসে অধ্যাপনায় যোগ দেন। কর্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাংলা লেখায় শিল্প-সুষমা বর্তমান। 'অব্যক্ত' নামক পুস্তকে তার রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

১৯০০—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু যখন তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণায় জৈব ও অজৈব পদার্থে উত্তেজনার ফলে সাড়ার ক্ষমতা সপ্রমাণে নিরত—এ তখনকারই কথা। 'রেস্পন্সেস্ ইন্ দি লিভিং এণ্ড নন্লিভিং' পুস্তকে তাই বর্ণিত। ভারতীয় ধর্ম-পুরাণে বিশ্বাসী জগদীশচন্দ্র অতি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় আদর্শের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অতি সুন্দর সমন্বয় আমরা দেখতে পাই।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম, দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল, মানুষের লেখার ভঙ্গী হইতে তাঁহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একই রূপ

চিহ্ন দেখিলাম, আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল, যে সাড়া-দিবার শক্তি জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুইজন অগ্রণী ইহাতে বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থতত্ত্ববিদ্, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল।

যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন। ফলে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডশ্রম হইয়াছিল। এই সকল স্মৃতি অতি ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করেন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন।

ভাগ্যচক্র ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। তাহার নিয়ম, উত্থান, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া সেই ঘন দুর্যোগে আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাভূত করিতে পারে নাই, সেই দুর্যোগও এক দিন অভাবনীয় রূপে কাটিয়া গেল।

বিলাত হইতে আগত জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আসিলেন। উদ্ভিজ্জীবন সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে সকল

কর্মকার আমার শিক্ষা অনুসারে এই সকল নির্মাণ করিয়াছে তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশ-সেবক।" সেই দিনের আগন্তুক পরবর্তী কালের ভারত সচিব মণ্টেগু।

ইহার পর গভর্নমেণ্ট ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস্, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়।

এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই সংঘবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই অসম-সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল, এবং যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বর্তমান অভাবনীয় উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেরারের অর্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বে ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেরারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগে না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেরার আমাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যায় তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এসকল সত্যের পরিণতি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তো চিরন্তন বীর নীতি, যাহা

আপনার পরাভবের মধ্যেও জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন,—সার্থক আমার শিক্ষা দান। এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের—

"অর্জুনস্য ইমে বাণাঃ নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।"

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য জীবন-পণ সাধনার আবশ্যক। জগতে তার প্রচার আরও দুরূহ, ইহাতে আমার পূর্ব সংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিনের সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁদের পথ যেন কোনদিন রুদ্ধ না হয়।

শব্দার্থ ঃ নির্মাণ—তৈয়ারী। অজ্ঞাত—অজানা। শারীরিক—শরীর সম্বন্ধীয়। অনুমান—ধারণা। উত্তেজক—উদ্দীপক। প্রয়োগ—ব্যবহার। অগ্রণী—প্রধান। অশোভন—মন্দ, খারাপ। ক্লেশজনক—কষ্টকর। নিরপেক্ষ—স্বাধীন। নিরন্তর—সর্বদা। বিস্মিত—অবাক। পর্যটনে—ভ্রমণে। সমুদয়—সমস্ত। আগন্তুক—অতিথি। প্রদর্শিত—দেখানো। অসম—অসমান। পরাভব—হার। অগ্নিবাণ—অগ্নি-উদ্গীরণকারী বাণ। মর্মস্থান—হৃদয়। জীবনপণ—জীবনকে পণ বা বাজী রাখিয়া। দুরূহ—কঠিন, কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞানক্ষেত্র—বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্র। সমর্থ—সক্ষম। চিরস্থায়ী—দীর্ঘস্থায়ী। অনুসরণ—অনুকরণ। রুদ্ধ—বন্ধ।

অনুশীলনী

১। জগদীশচন্দ্র বসু যখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন কি কি দেখিয়াছিলেন?

২। 'তাহার পর দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল'—কাহার পর? কি অশোভন ঘটনার কথা লেখক বলিয়াছেন।

৩। 'তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশ-সেবক'—একথা কে, কাহাকে বলিয়াছেন? কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন?

৪। 'এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল'—এখানে লেখক কোন সংগ্রামের কথা বলিয়াছেন এবং কিভাবে জয় হইল লেখ।

৫। 'উদ্ভিদবিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের দান' সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৬। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) 'যদি কেহ কোন······ হইয়া থাকেন।'

(খ) "অর্জুনস্য ইমে বাণাঃ··· ···শিখণ্ডিনঃ।'

৭। কোথায় অবস্থিত লিখ ঃ

ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও।

৮। শব্দার্থ লিখ ঃ

অন্তর্হিত, জীবতত্ত্ব-বিদ্যা, রীতি-বিরুদ্ধ, পণ্ডপ্রায়, ম্রিয়মাণ, প্রতিদ্বন্দ্বী, মর্মস্থান, অনুসরণ।

৯। পদ পরিবর্তন কর ঃ

শারীরিক, প্রচলিত, বিবেচিত, উৎসর্গ, প্রদর্শিত, প্রচারিত, দৃঢ়তর।

১০। সমাস নির্ণয় কর ঃ

অত্যাশ্চর্য, অশোভন, নিষ্প্রয়োজন, অভাবনীয়, চিরস্থায়ী।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। জগদীশচন্দ্র বসু কি কি জিনিস আবিষ্কার করেন?

২। পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইয়া জগদীশচন্দ্র কোন্ কোন্ স্থানে নিজ আবিষ্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন?

৩। 'কুরুক্ষেত্র' কেন এত প্রসিদ্ধ? অর্জুন, শিখণ্ডী ও ভীষ্ম কে?



কৃষি, শিল্প ও সমাজ

বিনয় ঘোষ

লেখকের কথা ঃ বিনয় ঘোষ বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ্। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র স্বাদের প্রবন্ধ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা তাঁর প্রবন্ধগুলোকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করে তুলে নি এবং অনবদ্য ভাষাশিল্প ও সারল্য দুরূহ বক্তব্যকে বোধগম্য করে তুলেছে। অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর কয়েকখানা বই রয়েছে, সেগুলো বাংলা জ্ঞান-ভাণ্ডারের এক বিশেষ দিককে উন্মোচিত করেছে।

লেখার কথা ঃ একটু চিন্তা করলেই আমরা জান্‌তে পারব যে আমাদের সভ্যতার ভিত গড়ে তুলেছে কৃষি কাজ। বৈদিক যুগ বা তারও আগের কাল থেকে দেখে এসেছি মুনি-ঋষি এমন কি রাজারা পর্যন্ত কৃষিকার্যে উৎসাহ প্রকাশ করতেন। যে ভূমিতে চাষ-আবাদ সম্ভব সেখানে প্রসার হয়েছে সভ্যতার —প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবগোষ্ঠীর স্থায়ী বাসস্থান। অন্যদিকে শিল্প—যা মানব সভ্যতারই প্রাণ-প্রদীপের মতো, তাও গড়ে উঠেছে এ কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করে।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হইল কৃষির আবিষ্কার। প্রাচীন ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন যে, সভ্যতার ইতিহাসে, অতি প্রাচীনকালে, আজ হইতে প্রায় দশ-পনের বিশ হাজার বছর আগে, নিঃশব্দে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল ; সেইদিন যেদিন মানুষ জানিতে পারিয়াছিল যে মাটি চাষ করিয়া বীজ ছড়াইয়া ফসল উৎপাদন করা যায়। ইহা না জানা পর্যন্ত মানুষ বনে-জঙ্গলে, স্থান হইতে স্থানান্তরে, বন্যজন্তু ও ফলমূলের

সন্ধানে যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। যেদিন মানুষ চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করিতে শিখিল, সেইদিন তাহার পক্ষে একস্থানে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব হইল। যখন তাহা সম্ভব হইল তখন কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গ্রাম এবং কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি গ্রাম্য-সমাজ গড়িয়া উঠিল। সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল এই কৃষি-নির্ভর গ্রাম ও গ্রাম্য-সমাজ হইতে।

আবার কৃষি-নির্ভর সমাজের ভিতরেও তফাৎ আছে। ধান, পাট, ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং চা, কফি বা রবার ইত্যাদি উৎপাদন করা এক কথা নয়। সবই মূলতঃ কৃষিকাজ হইলেও কাজের ভিন্নতা আছে। ধান ও পাট যেভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়, চা বা কফি ঠিক সেইভাবে করা হয় না। চায়ের বাগান রচনা করিতে হয়, সেই বাগান যত্ন করিয়া লালন করিতে হয়, চা তৈয়ারি করিয়া ব্যবসা করিবার জন্য ছোটখাট একটি ফ্যাক্টরিও বাগানের কাছে স্থাপন করিতে হয়। ধান ও পাট অনেক স্থানেই চাষ করিলে হইতে পারে, কিন্তু চা সর্বত্র হয় না। যেখানে চা-বাগান আছে সেখানে সেই অঞ্চলের স্থানীয় লোক ছাড়াও বাহির হইতে লোক ব্যবসা ও কাজ করিতে আসে। সেইজন্য চা-বাগান অঞ্চলে গ্রাম ও ছোট শিল্প-নগর মিলিয়া এক ধরণের মিশ্র-সমাজ গড়িয়া উঠে।

মানুষের জীবন-সংগ্রামের কলা-কৌশল বদলায়, জীবন-সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপও বদলায়। উনিশ শতকের নবজাগরণকালে ভারতীয় সমাজে যে নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও চিন্তা-ধারা প্রবর্তন হইল তাহা মানব-কেন্দ্রিক। মধ্যযুগের দৃষ্টি ও চিন্তা ধর্ম-কেন্দ্রিক, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক। মানুষ ও সমাজ তখন ছিল গৌণ, দেবতা ও ধর্ম ছিল মুখ্য। মানুষ তখন বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটিতেছে, মানুষের কিছু করিবার নাই,

দুঃখ-কষ্ট সবই নিয়তি বা ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ, ধর্মের ও ঈশ্বরের হাতের পুতুল মাত্র। এই ধরণের বিশ্বাসের ফলে মধ্যযুগে মানুষের দুর্গতির ও অবনতির সীমা ছিল না। উনিশ শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে আত্মবিশ্বাস জাগিল, শক্তিতে মানুষ যে কি করিতে পারে আর না পারে, তাহা মানুষ বুঝিতে পারিল। তাহার আত্ম-মর্যাদা-বোধ, স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বাধিকার-বোধ জাগিল, সমস্ত চিন্তার প্রধান উৎস ও কেন্দ্র হইল মানুষ, মানুষের উন্নতি, মানুষের কল্যাণ, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের আনন্দ। মানুষ ধর্ম বা ঈশ্বর বর্জন করিল না, কিন্তু তাহা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার হইল। মানুষের জন্য ধর্ম থাকিবে, ধর্মের জন্য মানুষ থাকিবে না। সর্বক্ষেত্রে মানুষ-ই হইয়া উঠিল প্রধান।

ফলে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে যে-সমস্ত নগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সঙ্গে বর্তমান যুগের শিল্প-প্রধান নগর ও শহরের পার্থক্য হইল অনেক। বাণিজ্যের বিস্তার, রাজা-বাদশাহের রাজধানী অথবা কোন বড় তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া নগর সকল গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বড় বড় কারখানা-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া একালে যে সমস্ত শহর ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একেবারে অন্য রকম। সে-কাল ও এ-কালের নগরের বাহিরের রূপের মধ্যে যেমন তফাৎ, ভিতরের মানুষ ও তাহার নাগরিক সমাজের মধ্যেও তেমনি তফাৎ। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে, কালের দূরত্ব দিয়াও তাহা মাপা যায় না।

আধুনিক যুগে এই সমাজের গুরুত্ব বেশি। এই সমাজকে শিল্প-সমাজ বলে। বড় বড় কারখানা ও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি নগর ও শহর গড়িয়া উঠে। কারখানার মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী ও কর্মচারীদের এই সব নগরে বাস করিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নানা শ্রেণীর লোক সেখানে কাজ

করিতে আসে এবং তাহাদের সেখানে বাস করিতে হয়। কারখানার জীবন এবং অফিস-আদালতের জীবনের ধারার মধ্যে পার্থক্য আছে। কারখানা হল শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি, জীবন সেখানে যন্ত্রের মত চলিতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কারখানার সাইরেন্ বা ভোঁ বাজে এবং তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া মানুষের প্রাত্যহিক কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। একত্রে চলা, একত্রে কাজ করা, একত্রে অবসর বিনোদন করা —জীবনের এ সম্মিলিত ছন্দ কারখানার শিল্প-সমাজের বাহিরে, অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। ইউরোপ-আমেরিকায় এই ধরণের শিল্পসমাজ অনেক আগেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে এইরকম শিল্পসমাজ দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। (ক) 'মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হইল কৃষির আবিষ্কার'—মন্তব্যের যথার্থতা আলোচনা কর।

(খ) কৃষি-নির্ভর সমাজের মধ্যেও যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

(গ) 'নবজাগরণ' কথার অর্থ কী? ঊনিশ শতকে ভারতবর্ষীয় সমাজ-জীবনে কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? ইহার সঙ্গে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার কোন পার্থক্য তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কী?

(ঘ) 'আধুনিক যুগে এই সমাজের গুরুত্ব বেশি'—'আধুনিক যুগ' বলিতে তুমি কি বুঝ? এখানে লেখক কোন্ সমাজের কথা বলিয়াছেন? ইহার গুরুত্ব বেশি কেন?

(ঙ) আলোচ্য নিবন্ধে মূলতঃ দুই শ্রেণীর সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে।—এই দুই ভিন্ন ধারার সমাজ-ব্যবস্থাটি কী? উহাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি পাশাপাশি সুসজ্জিত কর।

২। বিস্তৃতভাবে কথাগুলির ব্যাখ্যা লেখ ঃ (ক) 'মানুষের জন্য ধর্ম থাকিবে, ধর্মের জন্য মানুষ থাকিবে না'। (খ) 'জীবনের এই সম্মিলিত ছন্দ কারখানার শিল্পসমাজের বাহিরে অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না'।

৩। পরিচয় দাও ঃ গর্ডন চাইল্ড, যাযাবর, আদালত, সাইরেন্।

৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর ঃ

অগ্রগতি, গৌণ, স্বাধিকার-বোধ, প্রতিমূর্তি, বিনোদন।

৫। (ক) সন্ধি-বিচ্ছেদ কর ঃ আবিষ্কার, পর্যন্ত, স্বাধিকার।

(খ) সম-শব্দ লিখ ঃ মাটি, বন, ঈশ্বর।

(গ) লিঙ্গান্তর কর ঃ মানব, প্রাচীন, ঈশ্বর, রাজা, বাদশাহ্।

(ঘ) বিপরীত শব্দ লিখ ঃ বিখ্যাত, প্রাচীন, গ্রাম, প্রকৃত, জীবন, আনন্দ।

৬। যথার্থ উত্তর নির্দেশ কর ঃ (ক) মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হইল কৃষির—আবিষ্কার/কলকারখানার পত্তন। (খ) সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল—কৃষি-নির্ভর গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ/মহাকাশ যাত্রার সূচনা হইতে। (গ) মধ্যযুগের দৃষ্টি ও চিন্তা—ধর্মকেন্দ্রিক/মানবমুখীন। (ঘ) উনিশ শতকে মধ্যযুগে সর্বক্ষেত্রে—মানুষ/ধর্ম হইয়া উঠিল প্রধান। (ঙ) বর্তমানও প্রাচীনকালের সভ্যতায় যেমন তফাৎ—তেমনি পার্থক্য রয়েছে/নেই মানুষে। (চ) কারখানার জীবন আদালতের জীবনের মধ্যে—প্রচুর/অল্প কিছু পার্থক্য রয়েছে।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। সমাজগঠনের পূর্ব পর্যায়গুলির নাম কর।

২। আলোচ্য নিবন্ধে কী কী চাষের উল্লেখ আছে বল।

৩। সেকালের বিখ্যাত নগর প্রধানতঃ কী কী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বল।

৪। মধ্যযুগের কালসীমা নির্দেশ কর।

৫। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' কী? ভারতের বিখ্যাত কয়েকটি শিল্প-নগরীর নাম উল্লেখ কর।



চাঁদের দেশে যাত্রা

লেখার কথা ঃ গ্রহান্তরে যাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালের—যে আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ পায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে—যখন রাশিয়া মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে মহাকাশ জয়ের প্রথম পটভূমি রচনা করে। মহাশূন্যে চাঁদ নিকটতম প্রতিবেশী; কাজেই চন্দ্রবিজয়ের স্বপ্নই আমাদের হাতছানি দেয় প্রথম। রোমাঞ্চ ভরা এই ভবিতব্যের আকর্ষণ আমাদের প্রতিনিয়ত করে তুলে উদ্বেলিত। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলি—মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে রাশিয়া ও আমেরিকা। অবশেষে এই অন্বেষণ বাস্তবায়িত হয় ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে—আমেরিকার চন্দ্রাবতরণের মধ্যে। আলোচ্য প্রবন্ধ তারই চিত্র।

'হ্যালো হিউস্টন্! নীল আর্মস্টং বল্ছি—ঈগল নেমে পড়েছে'।

১৯৬৯ সালের ২রা জুলাই। সময় সকাল আটটা। চাঁদের বুকে নামল একখানি ভেলা—ঈগল। ঈগলের দরজা খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি মানুষ—নীল আর্মস্ট্রং। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠ্লেন 'হ্যালো হিউস্টন, অদ্ভুত, অদ্ভুত চমৎকার দৃশ্য'!

সমস্ত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশনে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখছে চন্দ্রে মানুষের এ অভিযান। প্রতিটি মুহূর্তে উত্তেজনায় অধীর—

আনন্দ এবং আশঙ্কায় শিহরিত। সর্বত্র একটা কি হবে, কি হবে ভাব—একটা অজানা আশঙ্কায় সকলেরই দুরু দুরু বক্ষ।

ওদিকে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামছেন আর্মস্ট্রং। এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে। আর একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেন চাঁদের আকাশ, চাঁদের মাটি। তারপর আস্তে আস্তে একটা পা রাখ্‌লেন চাঁদের মাটিতে। সৃষ্টি হল এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস—চাঁদের বুকে এঁকে দিল মানুষ তার প্রথম পদচিহ্ন। সমস্ত পৃথিবী উল্লাসে ফেটে পড়ল—আনন্দে, উত্তেজনায় চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। চাঁদের মাটিতে পা রাখ্‌তে রাখ্‌তে আর্মস্ট্রং বল্‌লেন, "একটি মানুষের পক্ষে এটি সামান্য পদক্ষেপ, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট এক উল্লম্ফন"। চন্দ্র বিজয় করে মানুষ স্থাপন করল প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার জয়ের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মহাকাশ জয়ে প্রথমে অগ্রসর হয় সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়া মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা জুলাই। এই উপগ্রহটির নাম স্পুট্‌নিক্—১। এরপর তারা 'লাইকা' নামে এক জীবন্ত কুকুরকে পাঠায়। ঐতিহাসিক এই কুকুরটি মহাকাশযানে চেপে পৃথিবী পরিক্রমা ক'রে নির্বিঘ্নে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, কিন্তু মহাকাশ থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে তার মৃত্যু ঘটে।

এরপর মানুষের ইতিহাসে চিহ্নিত হল একটি স্মরণীয় দিন—১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। ওই দিন সর্বপ্রথম রাশিয়ার একজন মানুষ—য়ুরি গ্যাগারিন, ভস্টক—৩-এ চড়ে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে নিরাপদে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলেন। তিনি মহাকাশে ছিলেন ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়ে ১৯৬৬ সালে রাশিয়ার মানুষ-বিহীন মহাকাশ লুনা—৯ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

লুনা টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠাল চাঁদের আলোকচিত্র এবং নানা মূল্যবান্ তথ্য।

সোভিয়েত রাশিয়ার মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এগিয়ে আসে মহাকাশ গবেষণায়। মহাকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য আমেরিকা ১৯৫৬ সালে স্থাপন করে 'নাসা' নামে বিরাট এক গবেষণা কেন্দ্র। নাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার টেকসাস্ অঞ্চলের হিউস্টন শহরে। হিউস্টনে প্রতিষ্ঠিত বলে নাসার সাংকেতিক নাম 'হিউস্টন'। আমেরিকা থেকে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, তার মহাকাশচারীদের নির্দেশ দেওয়া—সমস্ত থাকে এই হিউস্টনের বিজ্ঞানীর হাতে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীতে বসে এই বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের মহাকাশ-যান-লোক পরিচালনা করেন।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। চাঁদে যে-কোন জিনিসের ওজন পৃথিবীর যে কোন জিনিসের ওজনের ⅙ ভাগ মাত্র। যে মানুষের ওজন পৃথিবীতে ৬০ কিলোগ্রাম, চাঁদে তার ওজন হবে ১০ কিলোগ্রাম মাত্র। তাই পৃথিবীর মত চাঁদে মানুষ স্বাভাবিক-ভাবে হাঁট্‌তে চল্‌তে পারে না—সেখানে মানুষকে লাফিয়ে চল্‌তে হয়। চাঁদে ঝড়, জল, বাতাস বলে কিছুই নেই। চাঁদের পিঠে পাউডারের মত ধূলোর আস্তরণ জমে আছে, পা রাখ্‌লে পা ধূলোয় বসে যায়। চাঁদে আছে অজস্র বিরাট পাহাড়, বড় বড় গর্ত, নুড়ি, পাথর, জ্বালামুখ ইত্যাদি। চাঁদে কোন প্রাণী নেই—কোন শব্দ নেই। নীরব, নিস্তব্ধ, নিষ্প্রাণ চাঁদ অনন্তকাল যেন দাঁড়িয়ে আছে একভাবে।

এই চন্দ্রে অভিযান করলেন আমেরিকার তিনজন মরণ জয়ী বীর—নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন্ এবং মাইকেল্ কলিন্স্। তাঁরা যে মহাকাশযানে চেপে অভিযান চালিয়েছিলেন তার নাম

এ্যাপেলো—১১। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই কেপ্ কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। চাঁদ থেকে ৭০ মাইল উপরে মূল মহাকাশযান এ্যাপোলো—১১ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এল 'ঈগল', ঈগল চাঁদে নামার ভেলা। ঈগলে করে চাঁদের দিকে নামতে থাক্‌লেন আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন, আর মূলযানে থেকে চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে থাক্‌লেন কলিন্স্। অবশেষে ঈগল এসে থামল চাঁদের মাটিতে, মানুষের প্রথম পদক্ষেপ পড়ল চাঁদের বুকে। ঈগল চাঁদের যে জায়গায় এসে নেমেছিলেন তার নাম 'নিস্তরঙ্গ সাগর'। আর্মস্ট্রং চাঁদের বুকে খানিকটা পদচারণা করলেন, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়িয়ে নিলেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। চাঁদের মাটিতে দ্বিতীয় মানব অলড্রিন! তিনি উত্তোলন করলেন আমেরিকার জাতীয় পতাকা, বসালেন ভূমিকম্প নির্ণায়ক ভূ-কম্প-লেখ একটি যন্ত্র। তাঁরা অনেক ছবি তুল্‌লেন চন্দ্রপৃষ্ঠের, বেতারের মাধ্যমে সেগুলো পাঠালেন পৃথিবীতে। এরপর রাখা হল রাষ্ট্রসংঘের পতাকা। আসার আগে মানুষ চাঁদের বুকে রেখে এসেছিল নিম্নলিখিত অমর বাণীটি:

"চন্দ্রের এইস্থানে মর্ত্যমানব ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রথম পদক্ষেপ করে।

বিশ্বমানবের শান্তিবার্তা লইয়া আমরা আসিয়াছিলাম"।

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর মহাকাশযাত্রীরা উঠে এলেন ঈগলে। নির্বিঘ্নে নিরাপদে ২৪শে জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরে এসে অবতরণ করলেন চন্দ্রবিজয়ী তিন বীর।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। মহাশূন্যে প্রথম যাত্রী কে? য়ুরি গ্যাগারিন্ কিজন্য চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন?

২। পৃথিবী থেকে-চাঁদের দূরত্ব কত ? চাঁদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। প্রথম চন্দ্রবিজয়ী মহাকাশচারী কারা ? কোন্ মহাকাশযানে চেপে তাঁরা চন্দ্রাভিযান করেন ? 'ঈগল' কি ?

৪। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন্ চাঁদে কি কি কাজ করেছিলেন ?

৫। "একটি মানুষের পক্ষে এটি সামান্য পদক্ষেপ কিন্তু সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট এক উল্লম্ফন।"—কথাগুলি কোন্ প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে ? কথাগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লেখ।

৬। অর্থ লেখ ঃ

অবিস্মরণীয়, নির্বিঘ্নে, পরিক্রমা, বিচ্ছিন্ন, নিস্তরঙ্গ, গৌরবোজ্জ্বল, রুদ্ধনিঃশ্বাস।

৭। বিপরীত শব্দ লেখ ঃ খোলা, শেষ, আনন্দ, বিরাট, সৃষ্টি, মৃত্যু।

৮। পদ পরিবর্তন কর ঃ সমগ্র, শহর, অবস্থান, পাথর, সাংকেতিক।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ সালে কত তারিখে মানুষ প্রথম চন্দ্র বিজয় করে ?

২। সোভিয়েত রাশিয়া প্রেরিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম কি ?

৩। 'নাসা' কোথায় অবস্থিত ?

৪। চাঁদে মানুষ কি বাণী রেখে এসেছে ?

৫। আজ পর্যন্ত কতবার মর্তের মানুষ চাঁদে গিয়াছে ?

৬। সঠিক উত্তর নির্দেশ কর—

(ক) চাঁদের প্রথম মানুষ— য়্যুরি গ্যাগারিন্/আর্মস্ট্রং/অলড্রিন্।

(খ) চন্দ্রযাত্রার প্রথম সূচনাকারী দেশ— ভারতবর্ষ/রাশিয়া/আমেরিকা।

(গ) ১৯৭৫/১৯৫৭/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করে।

(ঘ) ঈগল/এ্যাপোলো/স্পুটনিক চাঁদের ভূমিতে প্রথম পা রাখে।

৭। ভিন্নার্থ-বোধক শব্দটি বাদ দাও ঃ জল/বারি/পাণি/সলিল/সমর

আকাশ/নভ/ব্যোম/হিমাংশু

চন্দ্র/শশধর/ভানু/হিমাংশু

পৃথিবী/ধরা/রবি/নিখিল/ভূ

॥ পদ্যাংশ ॥



কৈকেয়ীর ব্যথা

কৃত্তিবাস ওঝা



কবির কথা ঃ আত্ম-বিবরণী থেকে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায়—তার উপর ভিত্তি করে কবির জন্মতারিখ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, পরে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতে থাকেন—কবির জন্ম ফুলিয়ায়। বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুর মিশনে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রথম ছাপার হরফে প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাসের ভাষা খুব সহজ ও সরল।

কবিতার কথা ঃ বাল্মীকির রামায়ণ যেভাবে দেশে প্রচলিত ছিল কৃত্তিবাস সেই ধারাকে অনুসরণ করে সাতখণ্ডে রামায়ণ রচনা করেন।—কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নি। ভ্রষ্টপথযাত্রী কৈকেয়ীর মনের পরিণতি আলোচ্য কাব্যাংশে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মহত্বও বর্ণনা করে কবি আশ্চর্য সৃজন-শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন।

(পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে)

দেশেতে আইল রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ-সমাচার ॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি ক'বেন রাম 'মা' বলিয়া ডাকি ?
যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, ন'লে ত্যজিব জীবন ॥

এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক ॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে ।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান ক'রে ॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী ।
অন্তরে জানিল তাহা রাম রঘুমণি ॥
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে ।
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর ঘরে ॥
অরণ্যে পড়িয়াছিনু অনেক প্রমাদে ।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে ॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস বদন ।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিল চরণ ॥
লজ্জায় কৈকেয়ী কহিছেন রঘুনাথে ।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ॥
বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি ।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি ।
আমার মাথায় দিয়া কলঙ্কের ডালি ॥
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা ।
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা ॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে ।
তব দোষ নাই—ভুঞ্জি দৈব বিড়ম্বনে ॥
তোমা হইতে পেলাম সুগ্রীব সুমিত !
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত ॥

তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥
তোমা হতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
রামবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা ॥

শব্দার্থ ঃ বিরস—ম্লান। বদন—মুখ। সমাচার—খবর। দেববিড়ম্বনে—দেবতার বঞ্চনায়। পতিব্রতা—পতিপরায়ণা। সতী—সাধ্বী। প্রসাদে—অনুগ্রহে। ব্যথা—বেদনা ; এখানে মানসিক কষ্ট।

অনুশীলনী

১। শুভ সমাচার, পূর্ণ আঁখি, অধোমুখ, বিষের লড্ডুক, ব্যথিত প্রাণ, বিরস বদন, কলঙ্কের ডালি, বড় হিত, পতিব্রতা সতী—শব্দযুগলের মধ্যে কারকগত সম্বন্ধ নিরূপণ কর।

২। কৈকেয়ীর মনে ব্যথার কারণ কি? তিনি কেন অভিমানাহতা হয়েছেন? এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হলো?

৩। কৈকেয়ীর মনের ক্ষোভের খবর শ্রীরাম কি করে পেলেন? কি উপায়ে তার সমাধান করলেন?

৪। 'তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন'—এই 'তুমি' কে? সাগর বন্ধনে এর দান কতটুকু এই প্রসঙ্গে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

৫। 'রামবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা'—কৈকেয়ীর ব্যথা দ্বিগুণ হইবার কারণ কি?

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ নির্ণয় কর ঃ—

সমাচার ; পরিপূর্ণ ; বিরস ; কলঙ্ক ; পতিব্রতা ; ভুঞ্জি।

৭। বাক্য রচনা কর ঃ—

অরণ্য ; সম্ভাষণ ; বিমাতা ; নিমিত্ত ; হেঁট ; ধর্ম্মাধর্ম্ম।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



জন্ম—১৮২৪, মৃত্যু—১৮৭৩

কবির কথা ঃ—বাংলা কাব্যের বিপ্লবী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাভাবপিষ্ট নিঃস্ব মধুসূদন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। তিনি বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারাকে ভেঙে নিয়ে নতুন ছন্দ, নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন রসপ্রবাহ আমদানি করেন। তিনি ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। মাত্র কয়েক বছর কাব্য চর্চা করেই বাংলা কাব্যের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটান। নাটক-প্রহসন ছাড়াও তাঁর 'শর্মিষ্ঠা', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য বাংলা কাব্যপর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলায় সনেট কবিতা তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। ইনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

কবিতার কথা ঃ—খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও, ইংরেজী আদপে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখলেও বাংলার মাটি ও মানুষ মাইকেলকে বিশেষ আকর্ষণের সূত্রে বেঁধে রেখেছিল। রামায়ণ ছিল তাঁর অতি প্রিয় কাব্য। আলোচ্য কবিতায় কবি 'বঙ্গভূমির প্রতি' তাঁর আকর্ষণ ও মমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সনেটগুলোতে তাঁর অন্তরের আকুতি আরো সুন্দর ও অনাবিলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো, তব মনঃ কোকনদে॥
প্রবাসে দৈবের বশে   জীব তারা যদি খসে

এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দানে সু-বরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে কি শারদে।

শব্দার্থ ঃ মা—মাতা, মাতঃ—এখানে বঙ্গজননী 'জন্মভূমিকে বুঝাইতেছে। মিনতি—প্রার্থনা, অনুনয়। মনের সাধ—অন্তরের বাসনা বা ইচ্ছা। পরমাদ—প্রমাদ, বিঘ্ন বা বিপত্তি। মনঃ কোকনদে—মন রূপরক্ত-পদ্মে। মধু হীন—মধু শূন্য, মধুসূদন বিহীন। প্রবাসে—বিদেশে। দৈবের বশে—ভাগ্যক্রমে। জীবতারা—জীবনরূপ তারকা। জীবননদে—জীবনরূপ নদীতে। শমনে—যমকে। মক্ষিকা—মৌমাছি। অমৃতহ্রদে—সুধার সরোবরে। মনের মন্দিরে—চিত্তরূপ দেবায়তনে। অমরতা—মরণহীনতা। যাচিব—যাচঞা করিব, প্রার্থনা করিব। শ্যামা—শ্যামবর্ণা এখানে শ্যামলবর্ণা জন্মভূমিকেই বুঝাইতেছে। জন্মদে—জন্মদাত্রী, জন্মদায়িনী। দয়া কর—অনুগ্রহ কর। দোষ—ত্রুটি। বর—আশীর্বাদ। দেহ—দানকর, দাও। সুবরদে—উত্তম বরদান-কারিণি। স্মৃতিজলে—স্মৃতিরূপ সলিলে অর্থাৎ স্মৃতিভাণ্ডারে। মানসে—মানস সরোবরে এখানে মনের সরোবরে। তামরস—পদ্ম, বসন্তে—বসন্তকালে (ফাল্গুন ও চৈত্র) শরদে—শরৎকালে (ভাদ্র ও আশ্বিন)। কি বসন্তে কি শরদে—অর্থাৎ সব ঋতুতে।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ ঃ

পরমাদ, কোকনদ, শমন, অমৃত, জন্মদে, সু-বরদে, তামরস।

২। পদান্তর কর ঃ—

জীব, অমর, মন, শমন, দাস।

৩। বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে পড়ার মত পংক্তি ঃ

(ক) 'প্রবাসে দৈবের·······নাহি খেদ তাহে।'

(খ) 'জন্মিলে মরিতে·····জীবন-নদে।'

(গ) 'সেই ধন্য·······সেবে সর্বজন।'

৪। প্রশ্নোত্তর লেখ ঃ—

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার বক্তব্য তোমার নিজের ভাষার লেখ।

(খ) কবির নিজের জীবনের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার কি কি মিল আছে কবিতার অনুসরণে তা ব্যক্ত কর।

(গ) এই কবিতাটির প্রথম আট লাইন মুখস্থ লেখ।

৫। সঠিক সমাস নির্দেশ কর ঃ

জীবতারা—রূপক-কর্মধা/অব্যয়ীভাব/তৃতীয়া-তৎ ?

চিরস্থির—উপমান-কর্মধা/অব্যয়ীভাব/তৃতীয়-তৎ ?

মনের মন্দিরে—ষষ্ঠীতৎ/রূপক-কর্মধা/দ্বিগু ?

সর্বজন—দ্বিগু/বহুব্রীহি/কর্মধারয় ?

জন্মদে—অব্যয়ীভাব/দ্বন্দ্ব/৫মী তৎপুরুষ ?

স্মৃতি-জলে—রূপক সমাস/নিত্য সমাস/উপমান ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। নরকুলে ধন্য কে ?

২। বাংলা ভাষায় কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ?

৩। 'প্রবাস'—শব্দটি দ্বারা এখানে কোন জায়গার কথা বলা হইয়াছে ?

ভারতের ভাগ্য

নবীনচন্দ্র সেন



কবির কথা ঃ—অধুনা বাংলা দেশের চট্টগ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কর্মকাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পাশ করে সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেন—বহুস্থানে ঘুরেন। কবি-শক্তির উন্মেষে শৈশবেই। ছেলেবেলায় ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত ও পরে মাইকেলের প্রভাব তাঁর কাব্যজীবনে দেখা যায়। দেশপ্রেম ও অসংযত উদ্দাম ভাবাবেগ তাঁর কাব্যের প্রধান লক্ষণ। 'পলাশীর যুদ্ধ', 'প্রভাস', 'কুরুক্ষেত্র', 'অমিতাভ', 'খৃষ্ট' প্রভৃতি ছাড়াও অনেক কবিতার বই তাঁর রয়েছে।

কবিতার কথা ঃ—আলোচ্য কবিতাটি 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যের অংশ বিশেষ। দেশপ্রেমিক নবীনচন্দ্র সেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে কাব্যের কাহিনী গ্রহণ করে কাব্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। গীতিকবি-সুলভ কাব্যের মাঝে মাঝে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু কবি আত্মভাব-চেতনার কেন্দ্রকে শক্ত করে ধরে কাব্যকে বিস্তৃত করেছেন। ইতিহাসের আখ্যানবস্তু অন্য ধারায় প্রবাহিত হলে ভারত তথা বাংলার ভাগ্যাকাশে কোন্ পতাকা উড্ডীন থাকত কবি তার ভিত্তিতেও কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। ঐতিহাসিক সত্যের পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে কবি ভারতের এ হেন ভাগ্য পরিণতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়, মধুমক্ষিকারে?

পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায় ?
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায় !
হইত না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার।

আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী—সুকুমার।

ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বৃক্ষ বীর্যের আধার।
আজি এ ভারত ভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষ-রত্নে ; দিগ্-দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্যে হ'ত বিভাষিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।

কল্পনে! সে দুরাশায় কাজ নেই আর ;
বৃটিশ্ শিবির ওই সম্মুখে তোমার।

শব্দার্থ ঃ—বিদরে-হৃদয়—হৃদয় বিদীর্ণ হয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। স্বর্ণপ্রসূ—স্বর্ণ-প্রসবকারিণী। মধুচক্র—মৌচাক। সুধাময়—অমৃতপূর্ণ। অনাহারে—না খাইয়া। মকরন্দ—ফুলের মধু। পাষাণ—পাথর। কলেবর—শরীর। সুকুমার—অতিশয় কোমল। উগ্রতর—অপেক্ষাকৃত তীব্র। ধমনীতে—শিরাতে। প্রবাহিত হত—বইত। নারী—স্ত্রীলোক, রমণী। রক্ত স্রোত—রক্তের ধারা। বীর্যের—বীরত্বের। আধার—পাত্র। পূরিত—পূর্ণ করিত। পুরুষ-রত্নে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা বীর দ্বারা। দিগ্-দিগন্তর—নানা দিক। ভারত-গৌরব সূর্য—ভারতের সুখ্যাতি বা সুনাম। বিভাসিত—আলোকিত। দুরাশায়—দুরাকাঙ্ক্ষায়। বৃটিশ শিবির—ইংরেজদের তাঁবু বা ছাউনি। সম্মুখে—সামনে।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ ঃ

বিদরে, স্বর্ণপ্রসূ, মকরন্দ, কলেবর. ধমনী, বিভাসিত, শিবির।

২। ব্যবহার-বৈচিত্র্য দেখাও ঃ....

পরাণে, কম্পনে, পূরিত, বধিতে।

৩। স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি :—

'কেন মধু চক্র বিধি......মধুমক্ষিকারে ?'

৪। প্রশ্নোত্তর লেখ ঃ—

(ক) 'ভারতের ভাগ্য' কবিতার বিষয়-বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

(খ) 'স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়, হইত না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার'—এখানে কবি কাহার অদৃষ্টের কথা বলেছেন এবং এই ক্রীড়াই বা কে ক'রে চলেছে ?—বুঝিয়ে বল।

(গ) 'ভারতের ভাগ্য' কবিতায় ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে কবির বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত কর।

৫। পথ নির্দেশ কর ঃ

হায়!—ক্রিয়া পদ/বিশেষ্য পদ/অব্যয় পদ ?

ভারত—অব্যয় পদ/বিশেষ্য পদ/বিশেষণ পদ ?

স্বর্ণ—(স্বর্ণ-প্রসবিনী)—বিশেষ্য পদ/সর্বনাম পদ ?

সজীব—অব্যয় পদ/বিশেষণ পদ/ক্রিয়া পদ ?

হইতে—অব্যয় পদ/ক্রিয়া পদ/বিশেষণ ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতাটি কবির কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত ?

২। 'বিদরে হৃদয়'—কবির হৃদয় বিদারণের কারণ কি ?

৩। কবিতার প্রথমেই কবি 'হায়।' শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন ?



হে ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম—১৮৬১, মৃত্যু—১৯৪১

কবির কথা ঃ—[গদ্যাংশ দ্রষ্টব্য]

কবিতার কথা ঃ—পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য সে যত দীন, যত হীনই, হোক না কেন তা আমাদের নিজস্ব সম্পদ—বার বার একথা বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যত চাকচিক্যই থাকু না কেন—তা পরস্ব ; এ কথাটি বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। পরের ঐশ্বর্য কোন অবস্থায়ই আমাদের দারিদ্র্য মোচন করতে পারে না, মাতৃভূমির নগণ্য দীন আয়োজন সম্পদসম্ভার আমাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে—দ্বিধাহীনভাবে কবি এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

হে ভারত আজি তোমারি সভায় শুনি এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ,
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের অন্ন নাহিকো জুটে,
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন—দীনের এ পূজা দীন আয়োজন,
চির-দারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধুলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে ॥

রাজা তুমিও নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষা ভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয় ।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন ।
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন তাই আমাদের দিয়ো ।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয় ॥
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব ।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্তে ভরিয়া লব ।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে জীবন নব ॥

শব্দার্থ : সভায়—দরবারে। নবীন—নূতন। হরষে—হর্ষে, আনন্দে। অর্ঘ্য—উপহার, দান। কাঞ্চন থালি—সোনার থালা। পর্ণপুটে—পাতার ঠোঙায়। সমারোহে—আড়ম্বরে। দীনের—গরিবের। মোচন—দূর। সুর দেবতা। সুর-দুর্লভ—দেবতারাও যাহা সহজে লাভ করিতে পারে না। প্রসাদ—অনুগ্রহ। মহাতাপস—বিরাট তপস্বী। ভিক্ষাভূষণ—ভিক্ষার পোষাক বা ভিখারীর বেশ। উত্তরীয়—চাদর। দৈন্যের—দীনতার। মৌনের—নীরবতার। অগ্নিবচন—আগুনের মত তেজোদীপ্ত কথা। সজ্জা—সাজ বা পোষাক। অভয় মন্ত্র—যে পবিত্র বাণীতে ভয় দূর হয়। অশোক মন্ত্র—যে পবিত্র বাণীতে শোক দুঃখ দূর হয়। তপোবন—তপস্যা করিবার উপযুক্ত বন। রাজাসনে—রাজার আসনে অর্থাৎ সিংহাসনে। মুক্ত—স্বাধীন। দীপ্ত—উজ্জ্বল। মহাজীবনে—শ্রেষ্ঠ জীবনে। চিত্ত—মন, হৃদয়,। মৃত্যুবরণ—যাহাতে মৃত্যুকে জয় করা যায় অর্থাৎ যাহা মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচায়। শঙ্কা হরণ—ভয় দূর কারী।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ :—

অর্ঘ্য, কাঞ্চন, পর্ণপুটে, তাপস, অগ্নিবচন, অশোকমন্ত্র, শঙ্কাহরণ।

২। পদান্তর কর :—

নবীন, হরষ, দীন, দারিদ্র্য, মৌন।

৩। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

(ক) 'কাঞ্চন থালি……পর্ণপুটে।'

(খ) 'দৈন্যের মাঝে……তোমার উত্তরীয়।'

(গ) 'দাও আমাদের অভয় মন্ত্র…… নব।'

৪। প্রশ্নোত্তর লেখ :—

(ক) 'হে ভারত' কবিতায় কবি কোন্ ভারতে, কি আকাঙ্ক্ষা করেছেন? কবিতার বিষয়-বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

(খ) প্রাচীন ভারতের সহজ-সরল জীবনের মধ্যে কবি যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখেছেন আলোচ্য কবিতার অনুসরণে তা ব্যাখ্যা কর।

(গ) 'হে ভারত' কবিতায় কবির ভারতভক্তি কতটা প্রগাঢ় ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বল।

৫। (ক) 'সুরদুর্লভ তোমার প্রাসাদ লইব পর্ণপুটে।'

(খ) 'শুর-দুর্লভ তোমার প্রাসাদ লইব পর্ণপুটে'—বানানগুলো দেখ এবং বল কোন্‌টা সঠিক।

৬। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

এনেছি মোদের ধর্মের মতি

কৃত্তিবাস লিখেছেন—

তোমা হতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা

—বানান বৈসাদৃশ্য কেন :

কোন্ বানানটি ঠিক?



বিদ্যাসাগর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম—১৮৮২, মৃত্যু—১৯২২

কবির কথা ঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রখ্যাত ছন্দ-বিশারদ রবীন্দ্রাদর্শনিষ্ঠ কবি। জন্ম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। অধীত বিদ্যার পরিধি ছিল ব্যাপক। ইতিহাস এবং পুরাণের নানা প্রসঙ্গ, প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের যা কিছু গর্ব ও গৌরবের বস্তু—তাকে জাতীয় চিত্তের সম্মুখে স্মরণীয় করে তাঁর কাব্য আকর্ষণীয় রূপ লাভ করেছে। হোমশিখা, তীর্থরেণু, হসন্তিকা, তুলির লিখন তাঁর সার্থক কাব্য-প্রচেষ্টা।

কবিতার কথা ঃ সরল ও সমুন্নত আদর্শবাদ, প্রখর স্বাদেশিকতাবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও উদার মানবিকতাবাদের উপরই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-ভিত্তি রচিত। বিদ্যাসাগর সে যুগের এক প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব—তাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনী মহিমায় বিদ্যাসাগর-কীর্তন দেখতে পাই। সুপ্রচলিত বাক্য-বিন্যাস পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের সীমাহীন মহিমাকে স্পষ্ট সুন্দর দীপ্তিতে কবি উজ্জ্বল করে তুলেছেন—এখানেই তার কৃতিত্ব।

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর।
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় !
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবুও নোয়াওনি শির জীবনে একবার !

দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার !
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ
করলে পূরণ অনাথ-আতুর-অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাইতো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্তি-ঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।
স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক
স্মরণ-চিহ্ন মূর্তি ! যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবনব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ? একি বিষম লাজ !
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

শব্দার্থ : নিঃস্ব—রিক্ত। অবতার—আবির্ভূত ঈশ্বর বা দেবতা। অনাথ—অসহায়। আতুর—রোগী। অভাজনে—দুঃস্থ ব্যক্তিকে। অশ্রুধারা—চোখের জল স্রোত। অদ্বিতীয়—একমাত্র। মূর্ত্ত—মূর্ত্তি যুক্ত বা সাকার। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—প্রাণ সঞ্চার। বীর্যে—বলিষ্ঠতায়। সুগম্ভীর—গাম্ভীর্য পূর্ণ।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ ঃ—

উদ্বেলিত, প্রত্যয়, সৌম্যমূর্তি অভাজন, আতুর, মূর্তি, নিরন্তর।

২। গদ্যে ব্যবহার কর ঃ—

এলে, বিদ্যে, খুঁজি, ভুলিয়ে।

৩। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ঃ—

(ক) 'সাগরে যে অগ্নি থাকে……হয়েছে প্রত্যয়।'

(খ) 'করলে পূরণ—অনাথ……তুমি করলে বারম্বার।

(গ) 'মানুষ খুঁজি তোমার মত …মৃত্যু-বিজয় নাম।'

(ঘ) 'বাংলা দেশের দেশী মানুষ……বীর্যে সুগম্ভীর।'

৪। প্রশ্নোত্তর কর ঃ—

(ক) কবিতাটির প্রথম মহত্ত্ব কবি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

(গ) বিদ্যাসাগরের জন্ম কোথায়? তাঁকে কেন 'সিংহশিশু বলা হলো? তিনি কি আদর্শ বাঙ্গালীর সম্মুখে রেখে গেছেন? 'মৃত্যু-বিজয় নাম' তাঁকে কেন দেওয়া যেতে পারে বুঝিয়ে বল।

৫। নিম্নরেখ শব্দগুলির কারক নির্ণয় কর ঃ—(ক) নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ। (খ) বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাক হায়। (গ) স্মরণচিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই।

৬। যথার্থ উত্তরে নির্দেশ চিহ্ন (✓) দাও।

(ক) 'বিদ্যাসার' ১৮২০/১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর/বীরভুম জেলার সিংহবীর/বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (খ) 'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়, চক্ষে দেখে অবিশ্বাসী হয়েছে প্রত্যয়'। রবীন্দ্রনাথ/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/নজরুল ইস্‌লাম—এই পঙ্‌ক্তির রচয়িতা।



লোকলজ্জা

কামিনী রায়

জন্ম—১৮৬৪, মৃত্যু—১৯৩৩

কবির কথা ঃ—কবি কামিনী রায়ের জীবন-পরিধি ১৮৬৪-১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। হেমচন্দ্রের কাছে তিনি প্রথম কবি-স্বীকৃতি পান। বিষাদ ও বেদনার গভীরতার মধ্যে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোই শ্রেষ্ঠ। তাঁর নীতি ও উপদেশাত্মক কবিতাগুলো বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। হেমচন্দ্রের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কাব্যযুগ প্রসারিত। দীপ ও ধূপ, জীবন পথে, গুঞ্জন, পৌরাণিকী তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

কবিতার কথা ঃ—'লোকলজ্জা' কবিতায় আমাদের অবচেতন উপলব্ধির এক সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রচলিত নীতি ও আদর্শের গন্ডির মধ্যে যে অসুবিধা জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে। কবি কামিনী রায় সর্বপ্রথম মেয়েলি ধরণের ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে উদার কাব্যাঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন এবং বিচিত্র বিষয়ে কবিতা লিখে প্রতিভার ব্যাপকতার প্রমাণ করেছিলেন। 'লোকলজ্জা' কবিতায় একটি বহুল প্রচারিত লৌকিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

করিতে পারি না কাজ সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে,—
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি, নীরবে আপনা ঢাকি
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত উঠে শুভ্র চিন্তা কত
মিশি যায় হৃদয়ের তলে,—
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে আঁখি সযতনে শুষ্ক রাখি
নিরমল নয়নের জলে
একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে—
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে এক সঙ্গে মিলে সবে
পারিনা মিলিতে সেই দলে
বিধাতা দেছেন প্রাণ থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে—
পাছে লোকে কিছু বলে।

শব্দার্থঃ সদা—সর্বদা। সংশয়ে—সন্দেহে। সংকল্প—দৃঢ় ইচ্ছা। টলে —ভাঙ্গিয়া পড়ে। পাছে লোকে কিছু বলে—অর্থাৎ আমার কাজের জন্য অপরে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা বা সমালোচনা করে বা কিছু মনে করে। আড়ালে—অন্তরালে। নীরবে—চুপ ক'রে। আপনা ঢাকি—নিজেকে লুকাইয়া রাখি। সম্মুখে চরণ নাহি চলে—অর্থাৎ সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিনা। বুদ্‌বুদ্‌—জলবিম্ব। হৃদয়ের তলে—মনের মধ্যে। আঁখি—চোখ, চক্ষু। সযতনে—যত্নের সহিত। শুষ্ক—নীরস। নিরমল—নির্মল, পবিত্র। স্নেহের —প্রীতির, আদরের। প্রশমিতে—নিবারণ করিতে বা উপশম করিতে। ব্যথা —যন্ত্রণা, কষ্ট। উপেক্ষার—তাচ্ছিল্যের, অবহেলার। মহৎ উদ্দেশ্য—সৎ অভিপ্রায়ে। মিলি সবে—সকলে একত্র হইয়া। বিধাতা—স্রষ্টা, ভগবান্‌।

ম্রিয়মাণ—বিষণ্ণ, বিমর্ষ। শক্তি—ক্ষমতা। ভীতির—ভয়ের, শঙ্কার। কবলে—আয়ত্তে, দখলে, গ্রাসে। শক্তি মরে ভীতির কবলে—অর্থাৎ কোন কাজ করবার শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও লোকলজ্জার ভয়ে তাহা করিতে না পারায় মনের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। কোন কাজেই সামর্থ্য খাটান যায় না।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ :—

সংশয়, সংকল্প, বুদ্‌বুদ্‌, নিরমল।

২। কয়েকটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি :—

(ক) 'হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত ····· লোকে কিছু বলে।'

(খ) 'বিধাতা দেছেন প্রাণ······লোকে কিছু বলে।'

৩। প্রশ্নোত্তর লেখ :—

(ক) 'লোকলজ্জা' কবিতার বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

(খ) কাজ করতে গিয়ে লোকলজ্জা দ্বারা আমরা কতটা প্রতিহত হই, কামিনী রায়ের কবিতার অনুসরণে তা ব্যক্ত কর।

(গ) কবিতার 'লোকলজ্জা' নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে বল।

৪। 'একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা' অর্থ প্রকাশে কি ব্যর্থ না অর্থ আরো স্পষ্ট হয়েছে বুঝিয়ে বল।

৫। বাক্যরচনা কর :—

লাজ ; শুভ্র ; ম্রিয়মাণ ; আঁখি।

৬। গদ্যে ব্যবহার কর :—

নিরমল ; দেছেন ; আপনা।



কবির কথা ঃ কল্লোল গোষ্ঠীর সর্বাধিক জনপ্রিয় এই কবির জন্ম হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে। জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। প্রবল প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন এই বিদ্রোহী কবি আবির্ভাব লগ্নেই সাদর অভ্যর্থনা পান। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশলগ্নে ব্যক্তিগত নিজস্বতায় এই কবি ছিলেন উজ্জ্বল। স্বাধীন শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর কবিতা সোচ্চার। আরবী-ফার্সী শব্দের সুপ্রচুরতায় তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে শিল্পশ্রী-মণ্ডিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য সৃষ্টিতে 'অগ্নিবীণা' 'দোলন চাঁপা' 'বিষের বাঁশী' বিখ্যাত। তিনি বহু গানের রচয়িতা।

কবিতার কথা ঃ—রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক অনাচার প্রভৃতি বিষয়ে কবি নজরুল যেমন লেখনী ধারণ করেছেন, তেমনি দীপ্ত যৌবনের গানকেও কাব্যের আখরে তিনি প্রকাশ করেছেন, জীবনের জয়গান করেছেন। আলস্য-জড়তায় কিংবা পরমুখাপেক্ষী না থেকে যদি ব্রহ্মরূপী আত্মার প্রকাশ ঘটাই তবে আত্মগ্লানীর কলঙ্ক ঘুচিয়ে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারব। একান্তভাবেই সূর্যের মত অনলস জীবনযাপন করা কর্তব্য।

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে—
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল!

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল্?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এ সব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।
'তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুরি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের তু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে তে-তলার 'পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি',
সকলের সাথে পথ চলি, যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!

আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি, খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !

শব্দার্থ: বাষ্প শকট—বাষ্পের সাহায্যে চালিত গাড়ি। ক্রোড়—কোটি। খুনে—রক্তে। ঠুলি—যাহা চোখকে ঢাকিয়া রাখে। শুধিতে—শোধ দিতে। গাঁইতি—এক প্রকার মাটি বা পাথর কাটার যন্ত্র। উত্থান—সূচনা। পদরজ—পায়ের ধূলি। বেদনা আর্ত—বেদনায় অধীর। নবারুণ—নূতন সূর্য।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লিখ :—নব-উত্থান, পদরজ, নবারুণ, ব্যথিত, ধরণী, অঞ্জলি নিখিল।

২। গদ্যরূপ লিখ :—দেখিনু, চলিছে, শুধিতে, সেবিতে, মাখি, উদিছে।

৩। পদপরিবর্তন কর :—রাঙা, ঋণ, পবিত্র, ব্যথিত, মমতা, অঞ্জলি।

৪। যথাযথ উত্তর দাও :—(ক) বর্তমান সভ্যতা কাহারা কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছে? এই সভ্যতার সৃষ্টিকারীরা তাহার পরিবর্তে কি ফল লাভ করিতেছে? কাহারা সভ্যতার ফল লাভ করিতেছে? (খ) 'আসিতেছে শুভদিন' কোন্ কবিতার অংশ? কে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন? কবি কোন্ শুভদিনের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছেন? কিভাবে সেই শুভদিন আসিবে? সেদিন সমাজের অবস্থা কি হইবে বলিয়া কবি নির্দেশ দিয়াছেন? (গ) 'তব-পদরজ'—কার পদরজ? পদরজ নিয়ে কে কি করবে? (ঘ) "চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!"—কবি কাদের মিথ্যাবাদীর দল বলে ধিক্কার দিয়েছেন?

৫। ব্যাখ্যা লিখ :—(ক) 'বেতন দিয়াছ?……পেলি বল?'

(খ) "তুমি জাননা…… মানে?"

(গ) "সিক্ত যাদের……তাহাদেরই বশে"

(ঘ) "আজ নিখিলের……প্রভাতের নবারুণ।"

কর্তব্য

গোবিন্দচন্দ্র দাস

জন্ম—১২৬১, মৃত্যু—১৩২৪

কবির কথা ঃ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের জয়দেবপুরে গোবিন্দ দাস জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সামান্য শিক্ষা ও চাকরি সবই ভাওয়াল রাজানুকুল্যে। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কবির সমগ্র জীবন কাটে—কবিতাতেও তার ছায়া প্রতিভাত। তীব্র আবেগ ও গভীর আন্তরিকতা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক বর্ণনা তাঁর কবিতায় বাস্তব-সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। 'প্রেম ও ফুল', 'মগের মুল্লুক', 'প্রসূন', 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

কবিতার কথা ঃ সংসারের শত বাধা-বিঘ্ন যদি না পৌরুষ শক্তি দ্বারা বিজয় করতে পারি, প্রতিষ্ঠা আমাদের কোন অবস্থায়ই আসবে না। পরম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে নিজের পথকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে—এ বক্তব্য কবি তার কবিতায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সহজ ভাষায় আবেগ-প্রাচুর্য প্রকাশই গোবিন্দ দাসের কাব্য-বৈশিষ্ট্য।

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক!
এ সংসার কর্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুকু,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ-জয়েচ্ছুক।

দিতে হবে বজ্রশান
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

(২)

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জিবে গর্জুক।
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
হলে হও খণ্ড খণ্ড
সৃষ্টি করি লণ্ডভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া,
কি আনন্দ, কি প্রচণ্ড সুখ।

(৩)

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক!
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যতটুকু,
শত সূর্য করি গুঁড়া,
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক।

বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীর মদে,
আত্মগুপ্ত লুকায় শম্বুক।

শব্দার্থ ঃ ধৈর্য—ধীরতা। ধৈর্যধর—সহিষ্ণু হও। কর্মশালা—কাজের ঘর বা কারখানা। কালান্ত জ্বালা—প্রলয়কালীন আগুনের যন্ত্রণা। খাদ—অর্থটি এখানে অপবাদ বা দুর্ণাম। অযুত—দশ হাজার এখানে অসংখ্য। যুদ্ধে জয়েচ্ছুক—যে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চায়। শিরোপরে—মাথার উপর। গর্জুক—গর্জন করুক। অবনত—নীচু, অধোবদন। পদাঘাত—পায়ের আঘাতে। লণ্ডভণ্ড—ওলট্‌পালট্‌। ব্রহ্মাণ্ড—বিশ্ব জগৎ। গম্ভীর—ভারিক্কী। গৌরবভরা—সুখ্যাতি-পূর্ণ। মহদাম্ভে—অত্যন্ত গর্বের সহিত। ভেঙ্গেপড়া—পতিত হওয়া। প্রচণ্ড সুখ—অত্যন্ত আরাম। মরণ—মৃত্যু। জয়স্তম্ভ—জয়-সূচকথাম। আত্মঅবলম্বন—স্বাবলম্বন। অস্থি—হাড়, মেদ—চর্বি, মাংস। মজ্জা—হাড়ের ভিতর অবস্থিত চর্বির মত কোমল পদার্থ। শত সূর্য করি গুঁড়া—অর্থাৎ সকল শক্তির উৎস সৌর শক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া অথবা এক কথায় অসাধ্য সাধন করিয়া। বাধা-বিঘ্ন—আপদ-বিপদ। সিংহ ফেরে—সিংহ ঘুরিয়া বেড়ায়। বীরমদে—বীরের মত গর্বে। আত্মগুপ্ত—যে নিজেকে লুকাইয়া রাখে। সভয়ে—ভয়ের সহিত। শম্বুক—শামুক (ইহা সামান্য ভয় পাইলেই নিজেকে খোলের মধ্যে লুকাইয়া রাখে)।

অনুশীলনী

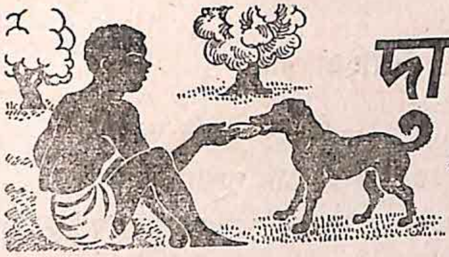
১। শব্দার্থ লেখ ঃ—কালান্ত, জয়েচ্ছুক, বজ্রনিশান, শিরোপরে, হিমাদ্রি, পতঙ্গ, ব্রহ্মাণ্ড, আত্মগুপ্ত, শম্বুক।

২। সহজ ও সরল অর্থে বিশ্লেষণ কর—

এ সংসার কর্মশালা
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুকু।

৩। হিমাদ্রির মত থাকতে কবি কেন উপদেশ দিয়াছেন? অবনত হলেই বা কি হবে? প্রচণ্ড সুখের উৎস কোথায়?—কবির অনুসরণে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

৪। 'স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ'—এ বাধা বিঘ্ন-বহুল সংসারে কি উপায়ে আমরা জয়স্তম্ভ স্থাপন করতে সক্ষম হবো বুঝিয়ে বল।



দাতা

কালিদাস রায়

জন্ম—১৮৮৯, মৃত্যু—১৯৭৫

কবির কথা ঃ—কবিশেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ জীবন কাব্য সাধনায় কাল অতিক্রম করে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বৈষ্ণব প্রীতিরস, পল্লীবাংলার শান্ত মাধুরী, প্রেম ও প্রকৃতির কবি কালিদাসের কবিতায় বিশেষভাবে বর্তমান। রবীন্দ্র প্রভাবেই এঁর কাব্যযাত্রা শুরু। কিছু কিছু গদ্য রচনাও তাঁর রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে কুন্দ, পর্ণপুট, বল্লরী, হৈমন্তী, বৈকালী বিখ্যাত।

কবিতার কথা ঃ—বৈষ্ণব ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কালিদাস রায় লৌকিক ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ আখ্যান-বস্তু নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সহজ ভাষায় সৃষ্টি এই গভীর তত্ত্বনির্দেশক কবিতাগুলো বাংলার কাব্যাঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এই পথে কবিশেখরের দক্ষতা অসাধারণ। ভারতীয় নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী কালিদাস রায় অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দুঃখীজনে,
তাহার তুল্য নাহি বদান্য বিশ্বাস মনে মনে !
একদা সহসা উদ্যান মাঝে সান্ধ্য ভ্রমণ কালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে আছে আলবালে।
দিবস শেষের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
একে একে দিল কুকুরের মুখে, বিচিত্র ব্যবহার !
কহিল জাফর, "ওরে কিঙ্কর সারাদিন উপবাসী,
দিবস শেষের খাদ্য—তাহাও কুকুরেরে দিলি হাসি ?"

চমকি ভৃত্য জোড় হাতে কয়—"মানুষ হয়েছি ভবে,
আজিকে ভাগ্যে না হয় আহার, কাল পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে? ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে নিখিল জীবের সেবা।"

কহিল জাফর আঁখি ছলছল্—"আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দর্প করিলি চূর্ণ ছিঁড়ি দিলি মোহ পাশ।
গুরুর মন্ত্র কানে দিলি তুই, দে রে কোল, বুকে আয়।"
কহিলেন ধীরে, "সেরা দানবীর তুই দীন দুনিয়ায়।
রাজকোষ যেবা মুক্ত করেছে বীর নাহি কই তারে,
সেই ত্যাগ-বীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে?
রে চির বান্দা, নহিস্ বন্দী—দিলাম মুক্তি প্রাণ,
এই বাগানের মালিক হইয়া—প্রাণ ভরে কর দান।"

শব্দার্থ: দাতার—যে দান করে তাহার। প্রধান—শ্রেষ্ঠ। দুঃখীজনে—গরীব লোককে। তুল্য—সদৃশ। বদান্য—দাতা। একদা—একদিন। সহসা—হঠাৎ। উদ্যান মাঝে—বাগানের মধ্যে। সান্ধ্যভ্রমণ—সন্ধ্যাবেলায় বেড়ান। হেরে—দেখিয়া। দাস—চাকর। ক্ষুধায় কাতর—ক্ষুধার্ত। আলবালে—বৃক্ষমূলে। দিবস—দিন। প্রাপ্য—পাওনা। বিচিত্র ব্যবহার—বিস্ময়কর আচরণ। কিঙ্কর—দাস। উপবাসী—না খাইয়া থাকা। খাদ্য—খাবার। চমকি—চমকিয়া উঠিয়া। বক্তা—যে বলে। মানুষ হয়েছি ভবে—অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভাগ্যে—বরাতে, কপালে। পুনরায়—আবার। খোদার—আল্লাহের বা ভগবানের। জীবে—প্রাণীকে। মোরা—আমরা। ধরাতে—পৃথিবীতে। নিখিল—সমুদয়। আঁখি—চোখ। ছলছল—জলপূর্ণ। আবিসিনিয়া—আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ। দর্প—গর্ব, অহঙ্কার। মন্ত্র—দীক্ষা। কোল—আলিঙ্গন। সেরা—শ্রেষ্ঠ। দানবীর—শ্রেষ্ঠ দাতা। দুনিয়ার—পৃথিবীর। রাজকোষ—রাজার ধন-ভাণ্ডার। মুক্ত

করেছে—খুলে দিয়েছে। ত্যাগবীর—দান-বীর। রুধির—রক্ত। হেলায়—অনায়াসে। বান্দা—দাস, চাকর। বন্দী—আটক পরাধীন। চির—সর্বদা, চিরকাল। মালিক—প্রভু, কর্তা।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লিখ :—

বদান্য, সান্ধ্য, আলবালে, কিঙ্কর, বান্দা, নিখিল, দর্প, দুর্দিনে, রাজকোষ।

২। নিম্নেরেখ শব্দগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) 'একে একে দিল <u>কুকুরের</u> মুখে বিচিত্র ব্যবহার'।

(খ) 'খোদার এ জীবে <u>আহার</u> কে দিবে'?

(গ) 'সেরা দানবীর তুই দীন <u>দুনিয়ায়</u>'।

৩। উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি :—

(ক) 'দিবস শেষের······বিচিত্র ব্যবহার'।

(খ) 'খোদার এ জীবে······নিখিল জীবের সেবা'।

(গ) 'রাজকোষ যেবা মুক্ত······যে দিতে পারে'।

৪। প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) দাতার প্রধান জাফর কখন্ কোথায় কি ভাবে প্রকৃত দাতার সন্ধান পেয়েছেন?

(খ) 'দাতা' কবিতার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

(গ) 'দাতা' কবিতার গল্পটি কেন তোমার ভাল লাগে বুঝিয়ে বল।

৫। নির্দেশ কর, কোন্ সমাসটি ঠিক?

তিনখানি—দ্বিগু/অব্যয়ীভাব/বহুব্রীহি?

সারাদিন—কর্মধারয়/দ্বিগু/অব্যয়ীভাব?

মোহপাশ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ/অব্যয়ীভাব/দ্বন্দ্ব?

রাজকোষ—দ্বিগু/ষষ্ঠী তৎপুরুষ/কর্মধারয়?

চিরবান্দা—কর্মধারয়/ষষ্ঠী তৎপুরুষ/দ্বিগু?



জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৭৭, মৃত্যু—১৯৫৫

কবির কথা ঃ—রবীন্দ্রানুসারি কবিসমাজের অন্যতম কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম কাব্য 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। করুণানিধান রোমাণ্টিক কবি; প্রেমের স্বপ্ন-সুন্দর রূপ, দাম্পত্য-জীবনের লীলামাধুর্য, প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় লাবণ্য এবং অধ্যাত্মসাধনার শুচিতা তাঁর কাব্যে সহজ-সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। 'ঝরা ফুল' 'শান্তি জল' 'ধানদুর্বা' ও 'শতনরী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।

কবিতার কথা ঃ—কবি কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের মত কবি করুণানিধানও বৈষ্ণব ভাবুকতায় নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন। আদর্শ ও সত্যানিষ্ঠ তাঁর কাব্য পরিধিকে আবৃত করে রেখেছিল। বুদ্ধদেবের জীবন অবলম্বন করে আলোচ্য কবিতাটিকে এক চির-সত্যের দীক্ষা আমাদের সামনে রেখেছেন। করুণানিধানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তত্ত্বের মাধুর্যকে সাবলীলভাবে, সুন্দর করে প্রকাশ করা। ভাষা সহজ, বলার ভঙ্গি সুস্পষ্ট, অন্যদিকে বক্তব্য সত্য, গভীরতায় অতল, অসীম।

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরিগো, দুলালে আগলি বক্ষে
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দর-বিগলিত-চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ শ্যেনের পক্ষে।
স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ মধুরসে পরিষিক্ত?

মুখ চম্পক মরুর বর্ণ,   শুষ্ক অধর কমল পর্ণ
কী পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষ বিন্দু রিক্ত ?
কোথা সে মাধুরী আধো আধো বোলে ?   কুন্দ-বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্য হাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে।
কোন্ পাষাণের বিষ-বাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ?
'অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধার-সম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার করো প্রাণদান।"
লুটায়ে যুবতী বুদ্ধ-চরণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ।
কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীবর-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চির-সুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোক নিলয়, ভিখ্ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"
বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা,
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, "শিখাইলে শেষ-শিক্ষা,
জীয়াতে চাহিনা তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে উঠে হাহাকার
হরো জগতের বিরহ-আঁধার দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লিখ ঃ—
দেউল, বিহগী, রসনা-প্রসূন, ইন্দু কান্ত, ত্রিতাপ দুঃখ, তনয়।

২। গদ্যে প্রয়োগ কর ঃ—
আগলি, পরসাদ, হরষে, হরিলে, দুরগম, পরশে, নিবেদিল।

৩। প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ—
(ক) কিসা গোতমীর গল্পটি তোমার নিজের ভঙ্গিতে ব্যক্ত কর।
(খ) বুদ্ধদেব কি ভাবে কিসা গোতমীর সমস্যার সমাধান করেছিলেন ?
(গ) 'জীবন-ভিক্ষা' কবিতার নামকরণ কতটা সার্থক ও সুন্দর হয়েছে ?



উত্তম পুরুষ

অন্নদাশংকর রায়

জন্ম—১৯০৪—

কবির কথা ঃ—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভাবাদর্শের দিক থেকে কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও তাঁর একটা নিজস্ব স্থান আছে। তিনি অসংখ্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেনে।

কবিতার কথা ঃ—অতি সহজ সরল ভাষায় ব্যবহারিক জীবনের অতি প্রচলিত সত্যকে কাব্যের অঙ্গনে স্থাপন করে তিনি এক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছেন।

ভিক্ষুক বলি তাকে।
"নাও নাও" বলে কখনও ডাকে না'
"দাও দাও" বলে হাঁকে।
ঘাতকেরও সেই ধারা ;
প্রাণ নেবে তবু প্রাণ দেবে নাকো,
মারবে, যাবে না মারা।
ব্যবসায়ী তার নাম
দেয় আর নেয় দুই হাতে তার
দক্ষিণ আর বাম
সৈনিক সেই মতো,
প্রাণের বদলে প্রাণ দেয়, নেয়
ক্ষতের বদলে ক্ষত।

প্রেমিক তারেই জানি,
নেয় নাকো, শুধু দিয়ে যেতে চায়,
রিক্ত উভয় পাণি।
তাই তুমি অভিনব
প্রতিদান তুমি নেবে না কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।
হে বন্ধু হবে জয়,
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।
জানি নে কী জানি কবে,
এই শুধু জানি হবে একদিন—
হবেই, হতেই হবে।

শব্দার্থ ঃ ঘাতক—জল্লাদ, হত্যাকারী। রিক্ত—খালি। অভিনব—নূতন। ব্যর্থ—বিফল। সৈনিক—সেনা। ধারা—রীতি-নীতি।

অনুশীলনী

১। বাক্য-গঠন কর ঃ—
নাও নাও, দাও দাও, ঘাতক, ব্যবসায়ী, অভিনব, প্রতিদান, আহুতি।

২। বিশেষ অর্থ বহনকারী অনুচ্ছেদ ঃ—
(ক) 'ভিক্ষুক বলি তাকে......'দাও দাও' বলে হাঁকে।'
(খ) 'ব্যবসায়ী তার নাম ......দক্ষিণ আর বাম।'
(গ) 'প্রাণের বদলে প্রাণ......রিক্ত উভয় পাণি।'

৩। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (ক) 'উত্তম পুরুষ' কবিতার বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিখ। (খ) 'উত্তম পুরুষ' কবিতায় উত্তম পুরুষ কে, কেনই বা তাঁকে উত্তম পুরুষ বলা হয়েছে? (গ) আলোচ্য কবিতায় কবি ভিক্ষুক ব্যবসায়ী, সৈনিক, ও প্রেমিকের প্রকৃতি কিরূপ বিশ্লেষণ করেছেন? (ঘ) 'দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি'—কেন ব্যর্থ হবার নয় বুঝিয়ে বল।



কেন মিছে

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম—১৮৯৭, মৃত্যু—১৯৫৪

কবির কথা :—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় কলকাতায় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এম. এ. পাশ করার পর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দের কবিকৃতি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। যুগলক্ষণ তাঁর কাব্যভাবনাকে চিহ্নিত করেছে। বিংশ-শতকীয় নির্যাতিত মানবতার মুখচ্ছবি তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টায় প্রতিফলিত। গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর কাব্যকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'ঝরা পালক', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা' তাঁর বিখ্যাত কবিতা।

কবিতার কথা :—সমালোচক বলেছেন, তিনি উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খলার যুগে ধ্যানী কবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁর কাব্য 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দের কাব্য বিশ্লেষণে দু'টি উক্তিই কষ্টিপাথরের মত। জীবন ও জগৎ বিষয়ে এক অন্তহীন আগ্রহ যেমন তাঁর কাব্যকে গভীর তাৎপর্যে মূল্যময় করেছে, অন্যদিকে তেমনি কাব্যের বহিরঙ্গ বিন্যাসেও নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। শব্দ, ধ্বনি, ছন্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার বিন্যাসেও তিনি প্রচলিত কাব্যসংস্কার থেকে আমাদের এগিয়ে এনেছেন।

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর? কেন মিছে
জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে সোনার ময়ূরপঙ্খী
অশথের শাখার পিছনে?
কেন ধূলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে, শিশিরের
চুমো খেয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ?

খঞ্জনারা কেন নাচে ? বুলবুলি, দুর্গা টুনটুনি কেন
ওড়াউড়ি করে বনে বনে ?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত, ঘাঁটি বাঁধি,
ভালোবাসি নগর ও বন্দরের-শ্বাস !
ঘাস, সে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছুই নয়
আহা ! মোটর যে সব চেয়ে বড় এই মানব জীবনে।
খঞ্জনেরা নাচে কেন তবে আর ?
ফিঙা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে ?

শব্দার্থ ঃ মিছে—মিথ্যা। নীলাভ—নীল রঙযুক্ত। ময়ূরপংখী—ময়ূরাকৃতি নৌকা বিশেষ। গুচ্ছে গুচ্ছে—থোকায় থোকায়। খঞ্জনার—এক-প্রকার চঞ্চল পক্ষীর। কমিশন (Commission)—তদন্তের জন্য নিযুক্ত অনুসন্ধান সমিতি। ঘাঁটি—সমবেত হওয়ার স্থান। নগর—শহর। বন্দর—সমুদ্র বা বড়নদীর তীরে জাহাজ ভিড়িবার জায়গা। বুটের—বুট জুতার। ফিঙা—একরকম ছোট পাখী।

অনুশীলনী

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ—
নীলাভ আকাশ, ময়ূরপংখী, সোঁদাগন্ধ, মানব জীবনে।

২। উল্লেখযোগ্য পংক্তি ঃ—
'কেন মিছে নক্ষত্রেরা……শাখার পিছনে ?'

৩। উত্তর দাও ঃ—
(ক) 'কেন মিছে' কবিতার বিষয়বস্তু তোমার নিজের কথায় লেখ।
(খ) কবি কতটা সুন্দর করে এখানে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন সমালোচনা দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৪। নিম্নরেখ শব্দগুলির কারক নির্ণয় কর ঃ—(ক) কেন <u>চাঁদ</u> ভেসে ওঠে সোনার ময়ূরপংখী <u>অশথের শাখার</u> পিছনে ? (খ) বুলবুল, দুর্গা টুনটুনি কেন ওড়াউড়ি করে <u>বনে বনে</u> ? (গ) আমরা যে <u>কমিশন</u> নিয়ে ব্যস্ত। (গ) মোটর যে সবচেয়ে বড় <u>মানব জীবনে</u>।



পল্লী-জননী

জসিমউদ্দিন

জন্ম—১৯০২, মৃত্যু—১৯৭৯

কবির কথা ঃ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মস্থান বিশেষভাবে বাংলাদেশে। দীনেশ সেন যখন পূর্ব বাংলার পালাগান সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন কবি দীনেশ সেনের মত শহরে পরবর্তী পর্যায়ের নানা কবিতা সৃষ্টির সম্ভারে নিজের কাব্য-সৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত করেন। তিনি মুখ্যতঃ পল্লীকবি। বাংলার গ্রাম্য-জীবনের বাস্তব নিখুঁত চিত্র তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত। তাঁর আখ্যান কাব্যগুলো বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট, নক্সীকাঁথার মাঠ' তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

কবিতার কথা ঃ—কলকাতায় কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা যখন কাব্য-তানপুরার সপ্ততারে সুর ঝঙ্কার তুলে আসর জমিয়েছেন, কবি জসিমউদ্দিন তখন বাংলাদেশের নিভৃতে বসে একতারার সুর-সম্পদ সৃষ্টিতে আত্ম-নিমগ্ন। আধুনিক কবিতার আলোর ঝলক জসিমউদ্দিনকে চমক লাগাতে পারেনি। তাঁকে টেনে নিয়ে ছিল ভেলুয়া, মহুয়া, কেনারাম ও মদিনার দল। আলোচ্য কবিতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

রাত থম্ থম্ শব্দ নিঝুম, ঘুমঘোরে আঁধিয়ার ;
নিঃশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায়—নিঃসাড় চারিধার।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হ'তে বহিছে বাতাস পঁচানো পাতার ঘ্রাণ
ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতল বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে আয়ু।

নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
'ছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও'—কাঁদে জননীর প্রাণ।
'ভাল ক'রে দাও আল্লা রসুল, ভাল ক'রে দাও পীর,
কহিতে কহিতে বুকখানিক ভাসে বহিয়া নয়ন-নীর।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
'বালাই, বালাই, ভাল হবে বাছা'—স্বপ্নের জাল বোনে।
কত কথা আজ মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে,
ছোট-খাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবারে!
খড়ের চালাতে ভূতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়, হাঁকে মায় 'দূর—দূর।'
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির প্রদীপ, এখনি নিভিবে বুঝি,
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যুঝি।'

শব্দার্থ ঃ থমথম—আতঙ্ক-পূর্ণভাব। স্তব্ধ—শান্ত। আঁধিয়ার—অন্ধকার। ঘনঘোর—ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন। ভনভন—মশা ও মাছির উড়ার শব্দ। বুনো—বনে থাকে বা জন্মে এমন। জমাট—ঘনীভূত। মশকের—মশার। এঁদো—পঁচা, মজা। ডোবা—গর্ত্ত বা ছোটপুকুর। পচনে—যাহা পচিয়া গিয়াছে এমন। ঘ্রাণ—গন্ধ। শীতল বায়ু—ঠাণ্ডা বাতাস। শিয়রে—মাথার কাছে। নামাজের ঘরে—মসজিদে। দরগায়—পীরের সমাধি স্থানে। রসুল—পয়গম্বর বা ঈশ্বরের দূত। পীর—মুসলমান সাধু। নয়ন-নীর—চোখের জল। শিহরে—রোমাঞ্চিত হয়। বালাই—অমঙ্গল, খণ্ডনসূচক উক্তি। বায়না—আব্দার। ভূতুম—বাংলাদেশের একপ্রকার পাখী (অমাঙ্গলিক)। অকল্যাণ—অমঙ্গল অশুভ। মরণের দূত—যম। পাশে—পার্শ্বে। হাঁকে—চিৎকার করে। আঁধারের—অন্ধকারের। যুঝি—যুদ্ধ করিয়া। ঝরিছে—ঝরিতেছে। ফুরায়ে—শেষ হয়ে। সাথে—সঙ্গে, সহিত।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ ঃ—

আঁধিয়ার, নিঃসাড়, এঁদো, নামাজ, শিহরে, অকল্যাণ।

২। সার্থক ভাবে বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—

থম্‌থম্‌, ভন্‌ভন্‌, মনে মনে, বালাই, ফোঁটায় ফোঁটায়।

৩। এই পংক্তিগুলির মধ্যে গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনা রয়েছে ঃ

(ক) 'ছোট কুঁড়ে ঘর, বেড়ায়……কাঁদে জননীর প্রাণ।

(খ) 'খড়ের চালেতে ভূতুম…… হাঁকে যায় 'দূর দূর'।

(গ) 'পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির……আঁধারের সাথ যুঝি।'

৪। অর্থের পার্থক্য দেখাও ঃ—

নীড়	জাল	মন	সুর	ঝরে
নীর	জ্বাল	মণ	শূর	ঝড়ে

৫। (ক) কবিতার নাম 'পল্লী-জননী' কেন রাখা হয়েছে—কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

(খ) 'পল্লী-জননী' কবিতার বক্তব্য নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

(গ) মায়ের মন এমন আতঙ্কগ্রস্ত কেন? অনাগত বিপদের পদধ্বনি কেন-ই বা তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলছে বুঝিয়ে বল।

৬। সঠিক উত্তর দাও ঃ

কহিতে কহিতে বুকখানি ভাসে—ক্রিয়া বিশেষণ/নামপদ?

শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা—অসমাপিকা/সমাপিকা ক্রিয়া?

গণিছে ছেলের আয়ু—নিত্যবৃত্ত অতীত/ঘটমান বর্তমান?

নামাজের ঘরে—মোমবাতি মানে—করণকারক/অধিকরণ কারক?

দূরেদূরে—ভাববোধক অব্যয়/বিয়োজক অব্যয়?

থমথম—ধন্যাত্মক অব্যয়/ক্রিয়া বিশেষণ?

ভাড়াটে কুঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র



জন্ম—১৯০৪—

কবির কথা ঃ—কল্লোর গোষ্ঠীর অনুসারী কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক জীবন-বাদকে তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র আশাবাদী কবি। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'সাগর থেকে ফেরা' বিখ্যাত।

কবিতার কথা ঃ—মানবতাবাদী দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত। সামান্য বস্তুকে নিয়ে অসামান্য কবিতার সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব। এই কবিতাটি তার-ই প্রতিচ্ছবি।

ভাড়াটে কুঠি।
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা
ওপরে ও নীচে নানা,
পাশাপাশি রোজ ঘর করে তাই
কেহ নয় কারো জানা।
শুধু দু'বেলায় চোখা-চোখি হয়,
একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি॥
একটি ইটের ব্যবধান রেখে
পাশা-পাশি থাকি শুয়ে,
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায়
ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে,
ওইখানে শেষ, তার পর আঁটা

জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
শুধু কোনদিন সঙ্গ-বিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ
কঠিন দেওয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা-কুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

শব্দার্থ ঃ ভাড়াটে—যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে। জঞ্জাল—ময়লা আবর্জনা। ঘর করে—বাস করে। সিঁড়ি—ধাপ। একইভুঁয়ে—একই মাটিতে। আঁটা—বন্ধ। সঙ্গহীন—নিঃসঙ্গ। করাঘাত—হাত চাপড়ান। ঘুচাইতে—দূর করিতে। ঘোচেনা - দূর হয় না। আড়াল—ব্যবধান, দূরত্ব। ব্যাকুল—ব্যগ্র। হৃদয়—অন্তর। মাথাকুটি—মাথা ঠুঁকিয়া।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লিখ ঃ—

ভাড়াটে কুঠি, জঞ্জাল, ব্যবধান, ভিৎ, ভুঁয়ে, বিদ্রোহ।

২। তাৎপর্যময় পঙ্‌ক্তি ঃ—(ক) 'নদীর স্রোতের··· কেহ নয় কারো জানা।' (খ) 'একটি ইঁটের ······ গাড়া একই ভুঁয়ে।'

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর নিজের ভাষায় লেখ ঃ—(ক) কবিতাটির নাম 'ভাড়াটে কুঠি' কতটা সার্থক হয়েছে কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বল। (১) কবির অনুসরণে 'ভাড়াটে কুঠির' স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৪। সঠিক পদ নির্দেশ কর ঃ—(ক) কুঠি—বিশেষণ/বিশেষ্য/সর্বনাম? (খ) ও—সংযোজক অব্যয়/বিয়োজক অব্যয়/ক্রিয়া? (গ) কঠিন—সর্বনাম/বিশেষণ/অব্যয়? (ঘ) ভাড়াটে—ক্রিয়া/সর্বনাম/বিশেষণ?

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য



জন্ম—১৩৩৩, মৃত্যু—১৩৫৫

কবির কথা ঃ—আধুনিক কাব্য পর্যায়ের সবচেয়ে আলোচিত কবি সুকান্ত ১৩৩৩ খ্রীঃ জন্ম, মৃত্যু ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যের মূল সুর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। 'ঘুম নেই', 'ছাড়পত্র'. 'পূর্বাভাস', 'অকাল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যসৃষ্টি।

কবিতার কথা ঃ—জগত ও জীবনকে এক নবতর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বিশ্লেষণ করে কবি সুকান্ত অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অবক্ষয়ের ঘুণে ধরা সমাজ-ব্যবস্থায় কৈশোরের প্রতিষ্ঠা ও জীবনের জয়গান তাঁর আলোচ্য কবিতার কথাবস্তু।

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ, বটবৃক্ষের সমাজে,
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা,
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তালে রেখে নেড়ে যাবে মাথা,
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছদের মুখে

সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায় শাখায় বাঁধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়,
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারি আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হয় নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে: সম্বর্ধনা জানাবে সকলে!
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবি বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো—হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে।
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখীরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখ: খনিজ, লালিত, সন্দিগ্ধ, বিদীর্ণ, সংহত, বনস্পতি, কূজন, পুষ্ট।

২। সন্ধি-বিশ্লেষণ কর: জীবন্ত, নগণ্য, বিদীর্ণ, উদ্দাম, প্রত্যাহত, সম্মতি।

৩। (ক) 'ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি'—কবির এরূপ উপলব্ধির কারণ কি! কেনই বা কবি নিজেকে বনস্পতির মত বড় ভাবছেন?

(খ) 'আগামী' কবিতার বিষয়-বস্তু তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

(গ) 'সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়', শাখায় শাখায় বাঁধা প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়'—ছোট গাছ ঝড়কে প্রতিহত করার শক্তি কোথায় পেল? শিকড়-ই বা কোথায় শক্তির যোগান পেল? বৃক্ষ-রক্ষায় শাখার ভূমিকা-ই বা কি?

(ঘ) 'আগামী' কবিতায় যে ভবিষ্যতের বা আগামী দিনের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।